কানাডা কাহিনী

শুজা রশীদ

অনন্যা প্রকাশনী

সূচীপত্র

রচনা	পৃষ্ঠা
➢ Spider Man এবং একটি বাড়ির স্বপ্ন	৪
➢ আগওয়া ক্যানিয়ন	৮
➢ মৎসের এক দিন	১৪
➢ নায়েগ্রায় পিকনিক	২২
➢ সুখে থাকলে ভূতে কিলায়	২৮
➢ নব্য যুগের সন্তানেরা	৩৩
➢ কুটিরে তিনদিন	৩৭
➢ এই শহরে	৪৫
➢ তরমুজ জোড়া লাগায়ে দাও	৪৯
➢ CN Tower উচ্চ করি শির	৫৩
➢ পরোটা, সাধের পরোটা	৫৮
➢ ষোল আনাই মিছা	৬৬

লেখকের কথা

প্রতিটি মানুষের পথ চলাই একদিন শেষ হয়। সেই সমাপ্তি কোথায়, কিভাবে, কখন হবে তা যদি আমরা নির্ভুল বলে দিতে পারতাম তাহলে বেঁচে থাকার রোমাঞ্চ থেকে আমরা বঞ্চিত হতাম। দেড় দশক আগে উচ্চ শিক্ষার তাগিদে আমেরিকায় পাড়ি জমিয়েছিলাম। শিক্ষা শেষে কাজের তাগিদে ঘুরেছি আমেরিকার নানা প্রান্তরে কিন্তু যে কারণেই হোক কখনো সেভাবে কোথাও জড়িয়ে পড়া হয়নি।

ভাগ্যের চক্রে পড়ে শেষ পর্যন্ত পাড়ি জমাতে হলো কানাডাতে। নতুন বাস পাতলাম দুনিয়া খ্যাত টরোন্টো শহরে। খুব শীঘ্রই আবিষ্কার করলাম এক ফেলে আসা জগত যেখানে আচমকা হাতছানি দিয়ে ডেকে ওঠে বাল্যকালের কোন বন্ধু যার সাথে দেখা নেই দুই যুগ, অথবা ড্যানফোর্থ এ্যাভেনিউয়ের বাংলাদেশী দোকানে বাজার করতে গিয়ে থমকে দাড়াই ইউনিভারসিটি জীবনের দুই বন্ধুকে পেয়ে, আড্ডা জমে ওঠে কিছুক্ষণের জন্য, ফেলে আসা দিনগুলোর মত। অসংখ্য চেনা মানুষের সান্নিধ্যে ভুলেই গেলাম স্বদেশ ছেড়ে বাস গেড়েছি অন্য এক গোলার্ধে।

এটাই হচ্ছে টরোন্টোর বৈশিষ্ট্য। এখানে একবার যে পা রেখেছে তাকেই সে হৃদয়ের সমস্ত অর্ঘ্য দিয়ে নিজের করে নিয়েছে। এখানেও দুঃখ, বেদনা, যন্ত্রণা আছে; অন্যায় অবিচার, পাপ, লোভ, অনাচার, নোংরা রাজনীতি সবই আছে; কিন্তু সে সব কিছুকে ছাপিয়ে যেটা সবচেয়ে নজরে পড়ে তা হচ্ছে এর উষ্ণতা। মায়ের কোলে ছোট্ট এক শিশুর মত সেই উষ্ণতায় আমি যেন চির বন্দী হয়ে গেছি। এই আমার ঘর, এই আমার সংসার। বাংলাদেশ রয়ে যাবে হৃদয়ে আমৃত্যু, কিন্তু আমার জীবন কেটে যাবে সম্ভবত এই ভুমিতেই, এই নতুন দেশে, এই পরিচিত জনতার মাঝে।

Spider Man এবং একটি বাড়ির স্বপ্ন

GTA-র (Greater Toronto Area) অনেক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বহুতল এপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স। আমরা থাকি স্কারবরো-তে, একটি বাইশতলা দালানে। সব মিলিয়ে দুইশ'টির উপরে ভাড়াযোগ্য এপার্টমেন্ট। শুনেছি অনেকেই নাকি দুই-তিন পরিবার জোট পাকিয়ে এক এপার্টমেন্টে থাকে। গুজরাটি এবং শ্রীলংকানদের মধ্যে এই প্রবণতা বিশেষভাবে প্রকট - শুনেছি। যদিও একবার এক শ্রীলংকান মুভার আমাকে বলেছিলো সে এক চীনা পরিবারের মাল-সামান তাদের এপার্টমেন্ট থেকে সদ্যকৃত বাড়ীতে মুভ করতে গিয়ে আবিষ্কার করে একটি দুই বেড রুমের এপার্টমেন্টে মোট ছয়টি পরিবার বাস করছিলো। সব মিলিয়ে বাইশজন। দুই বেডরুমের একটি এপার্টমেন্টের ক্ষেত্র এক হাজার বর্গ ফুটের বেশী খুব একটা হয় না। কিন্তু শুনতে যতই অবিশ্বাস্য হোক, টরোন্টোতে এমন উদাহরণ ভুরি ভুরি। আমার ব্যক্তিগতভাবে তাতে কোন সমস্যা নেই। তোমাদের বাসা, তোমরা যেভাবে ইচ্ছা থাকো। কর্তৃপক্ষ যদি আপত্তি না করে, আমার কি? অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ জেনেও চোখ বুঁজে রাখে। আজকাল সবাই কোমর বেঁধে বাড়ি কিনতে লেগে গেছে, এপার্টমেন্ট ব্যবসা আর আগের মত রমরমা নেই। প্রায়শই ভাড়াটে পেতে বিলম্ব হয়।

আমাদের সংসার ছোট। আমি, স্ত্রী শিলি আর চার ছুঁই ছুঁই পুত্র জাকি। দুই বেডরুমের একটি এপার্টমেন্ট নিয়ে বাইশ তলায় থাকি। শিলি তারপরও ঘন ঘন খিটমিট করে জায়গা নিয়ে। বুঝতে পারি নিজের বাড়ি কেনার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে সে। বছর দু'য়েক হয়ে গেলো এখানে। চলতে ফিরতে ঝামেলা। নানান জাতের মানুষের মধ্যে বসবাসের ভালোমন্দ দুটো দিকই আছে। এক এক জন এক এক পদের। সিঁড়িতে, এলিভেটরে, করিডোরে গত রাতের বেঁচে যাওয়া পিজা থেকে শুরু করে মাছ মাংসেরও স্থান হয়। শিলি হলফ করে বলে সে সিঁড়িতে মূত্রের গন্ধও পেয়েছে। উপর থেকে ময়লা ফেলার shute আছে। দেখা যায় সেটার সামনে করিডরে পর্বতের মত মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ময়লার স্তর জমতে থাকে। আর চিৎকার - চেঁচামেচিতো লেগেই আছে। রাত তিনটার সময় ঘুম ভেঙে যায় পার্কিং লটে বাজতে থাকা চড়া ইংরেজি অথবা হিন্দি বাদ্য ও সংগীতে। এক সময় গজলের ভক্ত ছিলাম, এখন শুনলে শরীর জ্বলে। নীচতলায় চব্বিশ ঘণ্টা হেড়ে গলায় গজলের মহড়া চলছে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হয় এলিভেটর নিয়ে। এতোগুলি মানুষের জন্য মাত্র তিনটি এলিভেটর। তারমধ্যে একটি প্রায়ই নষ্ট থাকে। অন্য একটি 'সার্ভিস' এর জন্য ব্যবহৃত হয়। যার অর্থ কেউ নতুন ভাড়াটে হয়ে এলে কিংবা চলে গেলে তাদের জিনিসপত্র সরানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। মাঝে মাঝে বিশ মিনিট থেকে আধা ঘন্টা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকেছি এলিভেটরের আশায়। সেই দিনগুলোতে জীবনের প্রতি সমস্ত আগ্রহই হারিয়ে ফেলেছি। এপার্টমেন্টে ফিরে শিলির সাথে অকারণে কোমর বেঁধে ঝগড়া করার পর আবার জীবনের অর্থ নতুন করে আবিষ্কার করতে হয়েছে। দুইশ'টি এপার্টমেন্টে চারশ'টি পরিবার থাকার যে কোন কুফল নেই সেটা বোধহয় যথাযথ নয়। এলিভেটরের জন্য অপেক্ষা করতে হলেই আমি মনে মনে গাল ঝাড়তে থাকি। আমার ধারণা আমি নতুন কিছু গালিও তৈরী করেছি।

একদিন মাঝরাতে জাকি ঘুমিয়ে পড়বার পর আমরা মিয়া-বিবি জরুরী বৈঠকে মিলিত হলাম।

"আর কতদিন এভাবে?" শিলির কড়া প্রশ্ন।

কাঁধ ঝাঁকাই । "বাড়ি কিনবে? টাকা কোথায়?"

“এখনতো শুনেছি মাত্র ৩% দিয়ে বাড়ি কেনা যায় ।”

“হ্যাঁ, তবে সুদ দিতে দিতে চুলে পাক ধরে যাবে ।”

“তাহলে তো বাড়ি কিনতেই চুলে পাক ধরে যাবে ।”

“টাকা বাঁচাও । সবতো আর একসাথে হয় না ।”

ভুল হলো । “কি? আমি বেশী খরচ করি? অন্যের বউদের দেখেছো? আমি ভালো বলে বেশী বাড় বেড়েছে .....”

পরিস্থিতি যখন শান্ত হলো ততক্ষনে রাত আরো গভীরতর হয়েছে । কিছু ঠান্ডা আলাপের পর স্থির হলো অর্থ সঞ্চয় ছাড়া গতি নেই । আর সঞ্চয়ের জন্য চাই খরচের হিসাব রাখা । আমি খাতা কলম বের করে মাস, বছর ইত্যাদির সমাবেশে তাৎক্ষনিকভাবে হিসেবের খাতা সৃষ্টি করলাম । নুন থেকে চিনি হোক, সব খরচ চলে আসবে এই খাতায় । খরচের লিস্টি দেখে সঞ্চয়ের পরিকল্পনা করতে হবে । দুজনেই এই একটি ব্যাপারে একমত হলাম । শিলি ঘুমাতে যাবার আগে শাসিয়ে গেলো - “মাছ ধরার সব জিনিসপত্র যেন ঐ লিষ্টিতে উঠে ।”

প্রথম সপ্তাহ ভালোই গেলো । সমস্যা এলো সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত কোণ থেকে । আমাদের গ্রোসারী আমরা ‘ফুড বেসিক’ থেকে করে থাকি । প্রতি সপ্তাহে একবার সেখানে হাজিরা দিতেই হয় । পুত্রের ফলমূলের প্রতি আসক্তি আছে । সে সাধারণত আপেল, কমলা, আঙ্গুর নেবার জন্যেই ব্যস্ত হয়ে উঠে । আমাদের তাতে আপত্তির কোন কারণ নেই । এগুলো হচ্ছে তাবৎ ভিটামিনের আখড়া । খাওয়া ভালো । কিন্তু আমাদের এবারের অভিজ্ঞতা আচমকাই এক অভিনব দিকে মোড় নিলো ।

ছেলে ও মা সকালে সিরিয়াল খায় । আমার নাস্তা করবার অভ্যেস নেই, ফলে কোন ঝুট ঝামেলা নেই । সিরিয়াল বোধ হয় শেষ হয়ে আসছে । দুজনে মিলে খুব সিরিয়াল বাছা হচ্ছে, লক্ষ্য করলাম । ভালো কথা । জাকির খাদ্যে আসক্তি অতি সামান্যই । যে কোন খাদ্যে সে আগ্রহ দেখালেই আমাদের হৃদয় তৃপ্ত হয় । বিশেষ করে শিলির মুখে যে মধুর হাসি ফুটে ওঠে তার তুলনা হয় না । হঠাৎই লক্ষ্য করলাম দুজনার মধ্যে হালকা বচসা শুরু হয়েছে । কি ব্যাপার? জানা গেলো হররোজ তারা যে সিরিয়ালটি খায় সেটা আজ ছেলের পছন্দ নয় । সে নিতে চায় স্পাইডারম্যানের পোস্টার লাগানো অন্য একটি ব্রান্ড । অল্প কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য করছিলাম ব্যাপারটা । স্পাইডারম্যান এর অবিশ্বাস্য সাফল্যের সাথে সাথে বন্যার জলের মতো অসংখ্য প্রডাক্টে তার নানান ভঙ্গির ছবি চলে এসেছে । বড়দের কাছে এর আবেদন নিতান্ত কম হলেও শিশুদের কাছে যে কম নয় তার প্রমাণ তখনিই পেলাম । জাকি দুই হাতে সিরিয়ালের বাক্সটাকে বুকের সাথে চেপে ধরে চিৎকার করছে – স্পাইডারম্যান নেবো । স্পাইডার ম্যান নেবো! জননী যুক্তি দিয়ে তার বোধোদয় করার মিথ্যে প্রয়াস পেলো ।

শিলি ও আমি শ্রাগ করলাম । ছোট মানুষ । কি আর আসে যায় । পুত্রের মুখে হাসি ফুটলো । ‘স্পাইডার ম্যান’ এর জয় হলো । কে জানতো সেই বিজয়ের পতাকা এমন গভীর করে আমাদের অস্তিত্বের মধ্যে রোপিত হবে । শীঘ্রই টের পেলাম কি সমস্যা পাকিয়ে উঠছে ।

পরের উইক এণ্ডে আমাদের খুবই ঘনিষ্ঠ একটি পরিবারের কাছ থেকে জন্মদিনের দাওয়াত এলো। তাদের চার বছরের ছেলে জনির জন্মদিন। মাঝে প্রায় মাসখানেক নানান কারণে তাদের বাসায় যাওয়া হয়নি। এতো অল্প সময়ে, এমন ভয়ানক পরিবর্তন আশা করিনি। জন্মদিনের পার্টিতে গিয়ে আমি একটু হকচকিয়ে গেলাম। যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই স্পাইডার ম্যান এর উগ্র উপস্থিতি।

মেঝেতে, সোফায় লুটোপুটি খাচ্ছে স্পাইডার ম্যানের নানান সাইজের পুত্তলিকা, সারি সারি দাঁড়ানো ছোট বড় স্পাইডার ম্যান গাড়ী, খেলনা, জামা কাপড়, মুভি, টুপি, টুথব্রাশ, টুথপেস্ট ..... । জনির সাথে জাকির গলায় গলায় ভাব। প্রতি পাঁচ মিনিটে একবার হাতাহাতি করা ব্যতিরেকে তাদের গভীর বন্ধুত্বে কোন বিঘ্ন ঘটে না। জাকিকে ভয়ানক আগ্রহ নিয়ে জনির স্পাইডার ম্যান সামগ্রীগুলো পর্যবেক্ষণ করতে দেখে আমার গলা শুকিয়ে এলো। সঠিক ধারণা না থাকলেও এটা বুঝতে অসুবিধা হলো না - এইগুলির কোনটিই খুব সস্তা নয়। অর্থনৈতিকভাবে পিতামাতাদেরকে বিব্রত করতে না পারলে এমন চাকচিক্যময় সামগ্রী বাজারে নামিয়ে বিক্রেতাদের লাভ কোথায়? এই সরলমনা শিশুগুলিকে নিয়ে ব্যবসা? আমার মস্তিষ্কে উষ্ণতা অনুভব করি। পরবর্তি কয়েক ঘন্টায় জনি থেকে জাকির মধ্যে যে স্পাইডার ম্যান সংক্রান্ত জ্ঞান প্রবাহিত হলো তার জের আমরা টের পেলাম দু'দিন বাদে।

শীত চলে আসছে। জাকির গত বছরের শীতের জ্যাকেটটা ছোট হয়ে গেছে। অফিস থেকে ফিরতে শিলি আমাকে এক রকম ধরে বেঁধেই শপিং মলে নিয়ে গেলো। প্রথম আধা ঘণ্টা সবকিছু নির্বিবাদে চললো। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম চার-পাঁচ বছরের একটি চীনা বালক মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে বিকট শব্দে চিৎকার করছে। তার বাবা-মা অসহায় ভঙ্গিতে পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে। আমাদের মত আরো অনেকেই কৌতুহলী। দোকানের কর্মীরাও হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো। খুব শীঘ্রই রহস্য পরিষ্কার হলো। ছেলেটা বায়না ধরেছে স্পাইডার ম্যান টি-শার্ট কিনবে। তার বাবা-মায়ের বক্তব্য অনুযায়ী ছেলেটির ইতিমধ্যেই তেমন টি-শার্ট আরো দু'টি রয়েছে। সে নতুন রং দেখলেই নেবার জন্য পাগল হয়ে উঠে। বালকটির ভয়াবহ চিৎকার, চেঁচামেচিতে উপস্থিত দাদু-দিদিমাদের হৃদয় গলে গেলো। কয়েকজন চক্ষু লজ্জা ঝেড়ে ফেলে বলেই ফেললো - "দাও না কিনে বেচারাকে। কতই বা দাম?" আমি আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম - পয়ত্রিশ ডলার। কতই বা দাম? দিদিমা, এতই যদি দরদ, দাও না কিনে। দোকানের কর্মী মেয়েগুলি বয়সে তরুণ। তারা এতো চিৎকারে বেশ ঘাবড়ে গেলো। তারাও ছেলেটির অসহায় বাবা-মাকে হাসি মুখে চাপ দিতে লাগলো - নিয়ে নাও। বেচারী এমন করে কাঁদছে। বেশীক্ষণ এমন করে কাঁদলে সিকিউরিটি চলে আসবে ..... ।

টি-শার্টটি কেনা হতেই ছেলেটির মুখে বিজয়ের হাসি ফুটে উঠলো। দিদিমারা পর্যন্ত তার পিঠে হাত বুলিয়ে সাবাশি দিয়ে গেলো। পিতা-মাতা সকলকে ফ্যাকাশে হাসি দিয়ে পুত্রের হাত ধরে টানতে টানতে দ্রুত দোকান থেকে বেরিয়ে গেলো। আমি বেশ বড়সড় করে মাত্র স্বস্তির নিঃশ্বাসটা ফেলেছি হঠাৎ হাতে টান অনুভব করলাম।

জাকি - "বাবা?"

আমি খুক খুক করে কাশি - "বলো, বাবা।"

"ঐ টি-শার্ট আমিও চাই। জনিরও আছে দুইটা।"

শিলি চোখ পাকিয়ে কিছু বলার আগেই আমি ফিসফিসিয়ে উঠলাম - "আর ঝামেলা করে দরকার নেই।"

গাড়ীতে উঠে সেই টি-শার্ট পরে তবে পুত্রের মুখে হাসি ফুটলো ।

গত সেপ্টেম্বর থেকে স্কুলে যেতে শুরু করেছে জাকি । ভেবেছিলাম স্কুলে গিয়ে কান্নাকাটি করবে । কিন্তু বাস্তবে তার উল্টোটাই হলো । আমি তার মাকে ক্ষেপানোর জন্য বলি -"তোমার সঙ্গ পেয়ে বেচারী এমন একঘেয়েমিতে ভুগছিলো যে স্কুলে গিয়ে ওর হাসি আর ধরে না ।"

জননী আমাকে একটা কড়া দৃষ্টি হানে । - "হ্যাঁ, সারাদিন তো আর ওর সাথে কাটাও না । তিন ঘন্টার জন্য স্কুলে থাকে, আমার হাড়ে একটু বাতাস লাগে ।"

আমি গম্ভীর গলায় বলি - "একটাতেই এই অবস্থা । আমি তো আধা ডজনের প্লান করছিলাম ।"

একটা কিল খেতে হয় । - "হ্যাঁ, সারাটা জীবন বাচ্চা-কাচ্চা পালি! মাস্টার্স ডিগ্রী নিয়ে ঘরে বসে আছি । কানাডায় কাজ কর্ম পাওয়া এমন ঝামেলা কে জানতো । এখন আবার নতুন করে পড়তে হবে ---"

যাইহোক, জাকির স্কুল নিয়ে আমাদের মনের অহেতুক দুশ্চিন্তা চলে যাচ্ছিলো প্রায় । কিন্তু একদিন তাকে হাপুস নয়নে ক্লাশ থেকে বের হতে দেখে মায়ের মন কেঁপে উঠলো । বাসা থেকে পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ স্কুল । শিলি দিয়ে আসে, নিয়ে আসে । ফিরতি পথে বিকট কান্নায় আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে দিলো পুত্রধন । অনেক অনুনয় বিনয়ের পর রহস্য উন্মোচন হলো । তার ক্লাশের অন্য একটি ছেলের স্পাইডারম্যান ব্যাগ রয়েছে, তার নেই । কেন নেই? আমি বাসায় ফিরতেই এই ভয়াবহ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হলো । আমাকে উত্তর খুঁজতে দেখে তাৎক্ষণিক আব্দার এলো - "চলো বাবা, এখন কিনবো ।"

আমি কাশি । - "এখন? এখন তো রাত হয়ে গেছে ।"

"রাত হলে অসুবিধা নেই । দোকান খোলা থাকে ।"

ছোট বলে তাদের বুদ্ধিমত্তাকে ছোট করে দেখার চেয়ে ভ্রান্তি আর কিছু হতে পারে না । অনুনয় - বিনয়, অনুরোধ, ধমক-ধামক দিয়েও তাকে টলানো গেলো না । সে উল্টা ভয় দেখাতে লাগলো - "আমি চিতকার করবো ।"

শেষ পর্যন্ত আমরাই হাল ছাড়লাম । কয়েকটি দোকান খুঁজে স্পাইডার ম্যান স্কুল ব্যাগের সন্ধান পাওয়া গেলো । সেই ব্যাগ ঘাড়ে ঝুলিয়ে সব কটি দাঁত উপস্থিত সবাইকে দেখিয়ে সগর্বে ফিরতি পথ ধরলো পুত্রবর । আরো কিছু টাকার শ্রাদ্ধ হলো ।

মাসের শেষে, জাকি ঘুমিয়ে যাবার পর স্বামী-স্ত্রী হিসাবের খাতা খুলে বসলাম । অনেক কষ্ট করে প্রতিটি খরচ লিষ্টি করেছি । ঘন্টা খানেক ধরে বিভিন্ন ধরনের খরচকে গ্রুপ করবার চেষ্টা করলাম । বাসা ভাড়া - ১০৫০, গ্রোসারী ৪০৫, গাড়ীর ইন্সুরেন্স ও তেল-৩১০, ... । অধিকাংশই স্বাভাবিক খরচ । প্রতি মাসেই তাদের অবধারিত আগমন । কিন্তু আমাদের দুজনারই দৃষ্টি যেখানে আটকিয়ে গেলো সেটা আমরা কেউই চিন্তা করিনি । স্পাইডার ম্যান - ২২০ । মধ্যবিত্ত একটি পরিবারের মাসিক সঞ্চয় যদি চার-পাঁচ'শ ডলার হয় তাহলে নিজেদেরকে সৌভাগ্যবান মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে টরোন্টোতে । এমনিতে কানাডায় ট্যাক্সের চাপ বেশী, তারপরে রয়েছে ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি ও অভাবনীয় খরচের লিষ্টি । তার মাঝে এই নতুন উপদ্রবটির উপস্থিতির তীব্রতা দেখে আমি ও শিলি পরস্পরকে গম্ভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করি । অনেক হিসেব

কিতেব করে দেখা গেলো এই মাসে আমাদের সঞ্চয়ের খাতায় জমেছে ১৫৮ ডলার। শিলি বিরস মুখে বললো – "এই গতিতে চললে বাড়ি কিনতে আমাদের চোখে ছানি পড়বে।"

আমি তিক্ত কণ্ঠে বলি - "বাড়িতো পরে। এই স্পাইডারম্যানের কবল থেকে কি ভাবে মুক্তি পাওয়া যায় তাই বলো।"

সে শ্রাগ করলো। "স্পাইডারম্যান গেলে আরেক ম্যান আসবে। আমাদের ক'টা টাকার দিকে সবার চোখ। পালাবে কোথায়?"

আমি হিসেবের খাতা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলি। এতো হিসেব করে লাভ কি? আড়চোখে তাকাই অর্ধাঙ্গিনীর দিকে। কোন আপত্তি আসে না। আমি নিঃসাড়ে একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। স্পাইডার ম্যানের উপদ্রবে অতিষ্ঠ হচ্ছি, কথাটি সত্যি, কিন্তু তাকে খানিকটা ধন্যবাদ না জানিয়েও পারি না। হিসেব লেখার চেয়ে বিরক্তিকর বস্তু পৃথিবীতে আর কিছু নেই!

বছরখানেকের একটা কন্ট্রাক্ট নিয়ে সু সেন্ট ম্যারি গিয়েছিলাম। টরোন্টো থেকে সাত শ' কিলোমিটার দূরবর্তি এই মধ্যম আকারের শহরটি দু'টি অংশে বিভক্ত। বৃহত্তর অংশটি কানাডায়, ক্ষুদ্রতরটি আমেরিকায়। মাঝখানে জলরাশি। একটি বিকটাকার ব্রিজ দুই তীরের মাঝে বন্ধনের সৃষ্টি করেছে। এখানে একটি লক আছে যা লেক সুপেরিয়র এবং লেক হিরনের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছে। উভয় দিকেই ক্ষুদ্রকায় কয়েকটি জাহাজ রয়েছে নৌবিহারের জন্য। কানাডার দিকে রয়েছে আরেকটি চমকপ্রদ আকর্ষণ - আগওয়া ক্যানিয়নে ট্রেন ভ্রমণ। দুর দুরান্ত থেকে টুরিস্টরা আসে এই ট্যুর নেবার জন্য। সু সেন্ট ম্যারিতে আসা অবধি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম, শেষ পর্যন্ত সেটি পাওয়া গেলো জুন মাসের মাঝামাঝি। স্বাভাবিকভাবেই এই ধরণের ট্রেন ভ্রমণের টিকিটের দাম বেশ চড়া হয়ে থাকে। বড়দের ষাট ডলারের মতো, ছোটদের পঁচিশ। জুন মাসে হঠাৎ করেই ট্যুর কর্তৃপক্ষ দুই দিনের জন্য স্থানীয়দের জন্য ভাড়া অর্ধেক করে দিলো। তাতে টিকিট কাউন্টারের সামনে আধা মাইল লম্বা লাইন পড়ে গেলো। অন্য সময় গ্রীষ্ম এবং শরৎ ব্যতিরেকে ট্রেন প্রায় শূণ্যই থাকে। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে শারদীয় রঙের বাহার দেখতে শত শত টুরিস্টরা, প্রধানত আমেরিকান, এই ট্রেন ভ্রমণে যায়। তখন বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে টিকিটের দাম বেশ খানিকটা বাড়িয়ে দেয়া হয়।

ট্রেনে চড়তে হয় নদীর তীরবর্তি স্টেশন থেকে। সকাল আটটায় ট্রেন ছাড়বার কথা। খুব ভোরে উঠে তড়িঘড়ি করে প্রস্তুত হয়ে, কিছু খাবার-দাবার বোঁচকায় বেঁধে, সাতটার দিকে স্টেশনে গিয়ে হাজির হলাম। অতি সতর্কতা। কোন অবস্থাতেই ট্রেন মিস করতে চাই না। তাছাড়া ভীড় যে হবে বুঝেছিলাম। তাড়াতাড়ি গেলে গাড়ী পার্ক করতে সুবিধা হবে। আমরা পৌঁছে দেখলাম সমগ্র শহর যেন উপচে পড়েছে সেখানে। মূল্য হ্রাসের গুরত্ব কতখানি বোঝা গেলো। আমাদের সাথে আরেকটি পরিবার যাবে। এই আশি হাজার মানুষ অধ্যুষিত শহরের মাত্র দ্বিতীয় বাংলাদেশী পরিবার। রাজীব ভাই তার স্ত্রী ও কন্যা নিয়ে প্রায় চার বছর এখানে বসবাস করছেন। স্থানীয় সু কলেজের অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেন। ইংল্যান্ড থেকে কানাডা এসে চক্রে পড়ে শেষ পর্যন্ত এই দুরবর্তি শহরে একটি ভদ্র কাজ পাওয়ায় চলে এসেছিলেন। আর ফেরা হয়নি। তাদের সাথে আমাদের পরিচিত হবার ঘটনাটি অভিনব। এখানে আসার পর প্রায় চার মাস আমরা কোন দেশী মানুষের সন্ধান পাইনি। রোজার ঈদের আগমনে শিলির হৃদয়ে বিশেষ আবেগের সঞ্চার হলো। সে টেলিফোন গাইড ঘেটে ঘেটে স্বদেশীয় নামের তালিকা খুঁজতে লাগলো। একাকি ঈদ করতে তার বুক ভেঙে যাচ্ছে। রাজীব নাম দেখে মনে খটকা লাগলো। সাথে সাথে ফোন করলো। আলাপ করতেই বেরিয়ে পড়লো – তারা যে শুধু দেশীই তাই নয়, রাজীব ভাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন নবীন শিক্ষক হয়ে ঢুকেছিলেন তখন এই অসম্ভব অমনোযোগী ছাত্রটির শিক্ষকতা করেছিলেন বেশ কয়েকটি মাস। তারপরে একটি স্কলারশীপ নিয়ে ইংল্যান্ড চলে যান। লজ্জাষ্কর হলেও সত্য আমার স্মৃতিতে রাজীব ভাইয়ের কোন ছাপ ছিল না। টরোন্টোতে বসবাসকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন বন্ধুকে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করে বড়ই অপমানিত হলাম। তারা রাজীব ভাইকে তাদের হাতের উল্টা পিঠের মতো চেনে।

ট্রেন ছাড়ার কথা ছিলো আটটায়। রাজীব ভাইদের দেখা মিললো মিনিট পাঁচেক আগে। অবশ্য ইতিমধ্যেই ঘোষণা দেয়া হয়েছে ট্রেনে নতুন বগি সংযোজন করতে হবে সবার স্থান সংকুলানের জন্য। সুতরাং ট্রেন ছাড়তে কিছু দেরী হবে। রাজীব ভাই তার স্ত্রী নুসরাত এবং কন্যা লতাকে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে স্টেশনে এসে হাজির হলেন। রাজীব ভাইয়ের বৃদ্ধ বাবা-মা তাদের সাথেই বসবাস করছেন। তারা আসেননি। পরিবারটির সাথে পরিচয় হওয়া অবধি কিঞ্চিৎ অশনির সংকেত পেয়েছি। ভাবী এখানে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন পছন্দ করেন না। তার টরোন্টো ফিরে যাবার প্রবল ইচ্ছা। রাজীব ভাই এই চাকরি ছেড়ে যেতে আগ্রহী নন। প্রায়শই নানান কারণে তাদের মধ্যে ঝগড়া ঝাটি চলে, বোঝাই যায়। লতা ষষ্ঠবর্ষীয়া। খুবই চঞ্চল প্রকৃতির। হঠাৎ হঠাৎ একদিকে ছুট দেয়। তাকে সামলানো দুষ্কর। লতা থাকলে জাকিকে সামলানোও দুষ্কর হয়। সে বয়েসে বছর দুয়েকের ছোট হলেও কোন অংশে কম যায় না। তাদের দুজনার সম্মিলিত শোরগোলে যে কারও বিরক্তির উদ্রেক হতে পারে।

অনেক টালবাহানার পর, উপস্থিত জনতাকে বক্ষে ধারণ করে আমাদের প্রাচীনদর্শন কিন্তু মজবুত ও সুপ্রশস্ত ট্রেনটি অবশেষে যখন স্টেশন ছাড়লো তখন সকাল নয়টা। আমরা পাশাপাশি আসনে বসলাম। বড় বড় সিট, উল্টো ঘুরিয়ে সম্মুখ অথবা পশ্চাৎমুখী করা যায়।

চমৎকার দিন। উজ্জল সূর্য আকাশ-বাতাস আলোকিত করে গগনে উদিত হয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে তার জ্যোতি আমাদের মতিতে কিঞ্চিৎ ব্যাঘাৎ ঘটালো। সকালের চড়া রোদ জানালা ভেদ করে মুখের উপরে এসে পড়ছে। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের যে আতিশয্য নজরে এলো তা আমাদের সামান্য তিক্তভাবকে মুহুর্তের মধ্যে ধুমায়িত করে দিলো।

আগাওয়া ওজিবওয়ে ইন্ডিয়ানদের দেয়া একটি নাম, এর অর্থ নিভৃত বন্দর। এমন নাম দেবার কারণ বুঝতে অসুবিধা হয় না। এই এলাকায় যাতায়াতের ব্যবস্থা প্রায় নেই বললেই চলে। ১৮৯৯ সালে এলগোমা সেন্ট্রাল রেলওয়ে নর্থ সেন্ট্রাল ওন্টারিওর মাইনিং শহরগুলোর সাথে গ্রেট লেকস - এর তীরবর্তি সু সেন্ট ম্যারি ও মিচিপিকোটিন হারবারের সাথে যোগাযোগ তৈরী করে। ৫১৬ কিলোমিটারের এই রেলপথ শেষ হয়ে হার্স্টে। ১৯৯৭ সালে এলগোমা স্টিল কোম্পানী ওয়াওয়াতে অবস্থিত তাদের মাইন বন্ধ করে দেয়ার ঘোষনা দেয়। ১৯৯৮ সালে রেলওয়ের এই বিশেষ অংশটি পরিত্যক্ত হয়ে যায়। বর্তমানে একমাত্র ট্যুর ট্রেনই চলে এই পথে।

আগওয়া ক্যানিয়ন ১৮০ কিলোমিটার উত্তরে। ট্রেন সেখানে পৌছাবে প্রায় চার ঘণ্টা পরে, দুপুর একটার দিকে। ঘন্টা দু'য়েকের বিরতি দেয়া হবে ক্যানিয়নের ভেতরে ঘোরাঘুরি করবার জন্য। তিনটার দিকে ফিরতিপথ। সন্ধ্যা সাতটার মধ্যেই ফিরে আসবো। সকলেই বেশ ফুরফুরে মেজাজে আছে। লতা ও জাকি তাদের স্বভাবজাত ছুটাছুটি ও চিৎকারে বাতাসে কাঁপন তুলে দিয়েছে। তবে ট্রেনে প্রচুর বাচ্চা-কাচ্চা থাকায় তাদের হুটোপুটি বিশেষ চোখে লাগছে না। শিলি তবুও কয়েকবার ধমকে তাদেরকে থামানোর চেষ্টা করলো। বিশেষ আমল পেলো না। রাজীব ভাই ও নুসরাত ভাবী পাশাপাশি বসে থাকলেও তাদের ব্যাজার মুখ দেখে বোঝা গেলো আজ সকালেও এক পশলা হয়ে গেছে। দু'জনার দৃষ্টি দুই দিকে।

ট্রেন দুলকি চালে চলেছে, সু সেন্ট ম্যারির শহুরে প্রান্তর পেছনে ফেলে নির্মল সবুজ বনানীর ভেতর দিয়ে সশব্দ ঝংকার ব্যস্ত পাখীর দল আর চঞ্চল কাঠবেড়ালিকে চমকিত করে। যত্রতত্র ছড়ানো নীলাভ ফোঁটার মত অজস্র ছোট ছোট লেক আচমকা উঁকি দিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে পশ্চাতে। সকালের ঝকমকা সূর্যের রশ্মির সোনালী ঝিলিক ধাঁধিয়ে দিয়ে যায় আমাদের দৃষ্টি। ভুমি এখানে কখন উত্তল কখন অবতল, কোনটিই খুব বেশি নয়। কিন্তু উচ্চতার তারতম্যের সাথে সাথে দৃশ্যের পরিবর্তন হৃদয়কে দুলিয়ে যায়।

ট্রেনের ভেতরের পরিবেশ আনন্দময়, স্বপ্নের আমেজে পূর্ণ। বড়রা শরীর এলিয়ে দুচোখ ভরে উপভোগ করছে বাইরের দৃশ্য। বাচ্চারা তাদের অকারণ ছুটাছুটি আর কলকাকলিতে মুখরিত করে রেখেছে পরিবেশ। আমি স্টিল এবং ভিডিও দুটি ক্যামেরা নিয়েই মহাব্যস্ত ভঙ্গিতে ক্রমাগত ছবি তুলে চলেছি। ডানে, বামে, সামনে, পেছনে। শিলি বিরক্তি নিয়ে বললো, "এক জিনিষ কতবার তুলবে?" আমি তাকে একটি কুটিল চাহনি দেই। বোকা মেয়ে! দু'টি দৃশ্য কি কখনো এক হতে পারে? ক্লিক! ক্লিক! ক্লিক!

যাত্রাপথে মন্ট্রিয়ল রিভারের উপরে একটি বাঁধ অতিক্রম করে যেতে হয়। বাঁধের উপরে অপূর্ব সুন্দর একটি কাঠের ব্রিজ আছে ট্রেন চলাচলের জন্য। এই দৃশ্যটি খুবই বহুল প্রচারিত। সকলে ক্যামেরা হাতে অপেক্ষা করে থাকে। আমরাও তার ব্যতিক্রম নই। দূর থেকে স্থানটি নজরে পড়তেই সকলে জানালার কাছে ভিড় করলো। ট্রেনের গতি কমিয়ে দেয়া হলো যাত্রীদেরকে এই অসম্ভব সুন্দর দৃশ্যটি প্রাণ ভরে উপভোগ করবার সুযোগ দেবার জন্য। ক্লিক! ক্লিক! ক্লিক! ট্রেন ধীরে ধীরে ব্রীজের পাদপ্রান্তে পৌঁছালো। আমরা তখন বিস্ময়ে অভিভূত স্বপ্নালু দৃষ্টি নিয়ে পিছু ফিরে ফিরে দেখছি অরণ্য আর জলরাশির সঙ্গমে দাঁড়িয়ে থাকা মনোহারী দৃশ্যটা। রাজীব ভাই এবং নুসরাত ভাবীও মুগ্ধ চোখে একবার পরস্পরের দিকে দ্রুত দৃকপাত করলো লক্ষ্য করলাম। ভালো লক্ষণ। আমরা যে প্রকৃতির সন্তান তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। একটি অপূর্ব দৃশ্য প্রিয়জনের সাথে দাঁড়িয়ে দেখার মর্মই আলাদা। আমি পশ্চাতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে ব্যাকগ্রাউন্ড করে শিলির পটাপট দু'টি ছবি তুলি। সে কটাক্ষ করে।

"খামাখা ছবি নষ্ট করছো। এখনো অনেক পথ বাকী"। আমি হো হো করে হেসে উঠি অকারণে। হৃদয় হলো পাগল ওগো তোমায় দেখে প্রিয়ে। মনে মনে গাই। আমার নজরল এবং রবীন্দ্র সংগীত লিখবার বাতিক আছে, গোপনে গোপনে।

প্রায় চারঘণ্টা পরে, অরণ্যের নিস্তব্ধতা এবং সমাহিত পরিবেশকে দলিত মথিত করে, সুদুর দিগন্তে লেক সুপেরিওয়র ও হাইওয়ে সেভেনটিনের অবয়বকে মুহূর্তে আড়াল করে দিয়ে আচমকা পাহাড়ি ঢাল বেয়ে নামতে থাকে আমাদের জান্তব সর্প। ঝিকির ঝিক, ঝিকির ঝিক। চারদিকে পাহাড় ঘেরা, একাধিক জলপ্রপাতে আবৃত, ছায়া নিবিড় একটি স্রোতস্বিনীর শীতল জলে সিক্ত যে সবুজ, সুশীতল প্রান্তরটি চোখে পড়লো তাতে বাকহারা হয়ে যেতে হয়। কে জানতো এই অরণ্য আর পর্বতের রাশির মাঝখানে এমন রত্ন লুক্কায়িত থাকতে পারে? ট্রেন যখন ধীরে ধীরে থামলো আমরা পড়ি মরি করে কে কার আগে নামবো সেই প্রতিযোগিতায় মেতে উঠলাম। বেশ একটা হৈ চৈ পড়ে গেলো। এখানে ট্রেন থামবে মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের জন্য। অনেক কিছু দেখার আছে। সময় নষ্ট করতে কেউ আগ্রহী নয়।

আমি, শিলি ও জাকি লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নীচে নামলাম। আমাদের পেছনেই রাজীব ভাই, ভাবী ও লতা। তাদের মুখে হাসি ধরে না। নুসরাত ভাবীর ঘন মেঘে ছেয়ে থাকা মুখে উজ্জ্বল সূর্যের ঝলক। আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে তিনি রাজীব ভাইয়ের হাত ধরবার চেষ্টা করলেন। রাজীব ভাই লাজুক মানুষ। হাত ছাড়িয়ে পকেটে ঢুকিয়ে ফেললেন। লতা ও জাকিকে উন্মাদের মতো নদীর দিকে ধেয়ে যেতে দেখে আমি ছুটলাম তাদের পিছু পিছু। দু'জনারই অসম্ভব জলপ্রীতি আছে এবং বিন্দুমাত্র কান্ডজ্ঞান নেই। তাদেরকে বগলদাবা করে ফিরে দেখলাম ওয়াশরুমের সামনে বিশাল লাইন পড়েছে। ছেলেমেয়েদের আলাদা বাথরমের ব্যবস্থা রয়েছে। সুভেনীরের দোকানপাট আছে। কয়েকটি খাবারের দোকানও চোখে পড়লো। আমার বাড্ডার (bladder) মহাশয় কর্মে অতিশয় পটু। বাথরুম দেখলেই আমাকে দাঁড়িয়ে যেতে হয়। এখানেও তার ব্যতিক্রম হলো না।

সকলের প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেয়া হলে ক্যানিয়ন ভ্রমণে বের হলাম আমরা। প্রায় ১ বিলিয়ন বছর আগে সৃষ্ট হয়েছিলো এই উপত্যকাটি। এখানে তিনটি নানান আকারের জলপ্রপাত এবং একটি আড়াইশ' ফুট উঁচু লুক আউট ট্রেইল আছে। দর্শকদের সুবিধার জন্য উপত্যকার মধ্যে মাটির রাস্তা তৈরী করা হয়েছে দর্শনীয় প্রতিটি স্থানে যাওয়ার জন্য। চক্রাকার রাস্তা। একদিকে শুরু করে অন্য দিক দিয়ে ফেরা যায়। আমরা নদীর পাশ ধরে মেঠো পায়ে চলা পথেই যাত্রা শুরু করলাম। রাজীব ভাইরা গেলেন অন্যদিকে। ঘোরাঘুরি শেষ করে ট্রেনে আবার মিলবো।

আমরা যথাক্রমে বিভার ফলস (১৭৫ ফুট), ব্রাইডাল ভেইল ফলস (২২৫ ফুট) এবং ওটার ক্রীক ট্রেইলের শেষ প্রান্তে অবস্থিত আরেকটি জলপ্রপাত দেখলাম। ব্রাইডাল ভেইল জলপ্রপাতটিই সবচেয়ে সুন্দর। শিলি মুগ্ধ কণ্ঠে বললো, "এখানে আমার একটা ছবি তোলো। জাকি এদিকে আয়, বাবা"। মাতা-পুত্র বেশ পোশাক-আশাক ঠিক করে, ভাব-ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলো ছবির জন্য পোজ দিয়ে । আমি ক্যামেরা হাতে তুলেই প্রমাদ গুনলাম। আবেগের বশে চব্বিশটি ছবির সবগুলোই শেষ করে ফেলেছি। পকেট হাতড়ে গলা শুকিয়ে গেলো। দ্বিতীয় রিলটা বাসাতেই রেখে এসেছি। শিলি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললো "ফিল্ম নেই, তাইতো? যখন আমি একটা ছবি তুলতে চাই, তখন তোমার ফিল্ম থাকে না! আমি কিছু চাইলেই তোমার সমস্যা দেখা দেয়। সেবার মন্ট্রিয়ল গিয়ে ..... "

পরবর্তি আধাঘন্টায় ফিরতি পথে বহু বিস্মৃত স্মৃতি মনে পড়ে যেতে বাধ্য হয়। সামান্য একটি ভুল বিকটাকার সমস্যার সৃষ্টি করে। জাকি দু'হাতে কান চেপে ধরে আছে। একটু পরপরই সে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইছে, "আম্মু, তুমি আব্বুকে বক্‌ছো, রাইট (right)? আমাকে না।"

আমি তাদেরকে পিছু ফেলে লুকআউট ট্রেইল বেয়ে উপরে উঠতে লাগলাম। প্রচুর কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে উপত্যকার প্রায় খাঁড়া দেয়াল বেয়ে আড়াইশত ফুট উপরে উঠলাম। শিলি এবং জাকি নীচেই দাঁড়িয়ে থাকলো। উপরে উঠে চারদিকের দিগন্তব্যাপি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে মোহিত হলাম। হাতে সময় বেশী নেই। ট্রেন ছাড়তে মিনিট বিশেক বাকী। ফিরতি পথও নিতান্ত কম নয়। আমি তরতরিয়ে নীচে নেমে আসি। রাজীব ভাইরা আমাকে দেখে হাসলেন। তারা ঘোরাঘুরি শেষ করে শিলি ও জাকিকে সঙ্গ দেবার জন্য দাঁড়িয়েছেন। রাজীব ভাই বললেন, "ক্যামেরার ছবি নাই তো আমাকে বল নাই কেন? আমারটাতে অনেক ছবি আছে"।

শিলি বক্রোক্তি করলো, "পাগলের পা ঝাড়া। ট্রেনে ফালতু ছবি তুলে সব শেষ করেছে"।

আপত্তিকর মন্তব্য। আমি গম্ভীর মুখে না শোনার ভান করি। ফিরতি পথে রাজীব ভাইয়ের ক্যামেরায় সবুজ ঘাসে জড়ানো চত্বরে ফটাফট ছবি তুলে ফেলি দল বেঁধে। স্রোতস্বিনীর উপরে একটি কাঁঠের সাঁকো। ক্লিক!

অনেক বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা সাথে খাবার দাবার এনেছিলেন। তারা নদীর পাশে আয়েশ করে বসে খাচ্ছেন। বোঝাই যায় এটি তাদের প্রথম আসা নয়। আমাদেরও ক্ষিধেয় পেট চোঁ চোঁ করছিলো। ট্রেনে উঠেই সবাই খাদ্যভান্ডারে হামলা দিয়ে পড়লাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই ট্রেন ছাড়লো। চারঘন্টার ফিরতি পথ। সকলের দৃষ্টিই জানালার বাইরে। অনেকের হাতেই সচল ক্যামেরা। ট্রেন খুব ধীর গতিতে উপত্যকার ঢালু দেয়াল বেয়ে উপরে উঠে এলো। ঝট করেই যেন ছায়া-নিবিড় স্বপ্নময় উপত্যকার নাড়ি ছিঁড়ে ছিটকে বেরিয়ে এলাম আমরা আবার অরণ্যের মাঝে। এবার আস্তে আস্তে সকলে যে যার আসনে জাঁকিয়ে বসে ঘুমের পায়তারা কষতে লাগলো। দেখা হলো, খাওয়া হলো, ঘোরা হলো। এবার ঘরে ফেরার পালা। ক্লান্ত, অভিভূত চোখ ঘুমিয়ে জড়িয়ে আসে।

যাত্রার সমাপ্তি অবশ্য বিশেষ সুখদায়ক হলো না। মাঝপথে আসতে জানা গেলো লাইনে গোলমাল ধরা পড়েছে। ট্রেন চলতে পারবে কিন্তু যেতে হবে অসম্ভব সতর্কতার সাথে। আমরা বাস্তবিক অর্থেই শম্বুক গতিতে এগুতে লাগলাম। বাচ্চারা এক ঘুম দিয়ে উঠে বললো, "বাসায় এসেছি?"

তাদের প্রশ্নের উত্তর কেউ দেয় না। শিলি অকারণ কাঠিন্য নিয়ে বলে, "কুফার সাথে বেরিয়েছি, এমনতো হবেই"। বড় আঘাত পাই হৃদয়ে। হৃদয় হলো পাগল ওগো তোমায় দেখে প্রিয়ে, কেমন করে আমায় এমন নিঠুর আঘাত দিলে? মনে মনেই গাই। সুরটি নজরল হবে না রবীন্দ্র হবে সেটা নিয়ে এখনো দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আছি।

চার ঘন্টার পথ সাত ঘন্টায় পেরিয়ে সু সেন্ট ম্যারিতে যখন পৌঁছুলাম তখন রাত দশটা। ট্রেনভর্তি ক্লান্ত, অবসন্ন, তিক্ত যাত্রীদের দল অবশ পায়ে নীচে নামলো। একটি অসম্ভব চমৎকার অভিজ্ঞতার ইতি এভাবে হতে পারে ভাবাই যায় না। ট্রেন কর্তৃপক্ষ ক্ষমা প্রার্থনা করে সকলকে 'রেইনচেক' দিলো। আমরা সম্পূর্ণ বিনা ব্যয়ে আরেকবার এই ট্রিপটি নিতে পারবো। মন্দের ভালো।

আমরা অবশ্য শেষ পর্যন্ত যাই নি। আমাদের একটি বন্ধু পরিবার টরোন্টো থেকে বেড়াতে এসেছিলো। তাদেরকে দিয়েছিলাম। তারা মুগ্ধ হয়েছিলো। আমাদের আনন্দ পরিপূর্ণতা পেয়েছিলো।

টরোন্টোর বাংলাদেশীদের ভেতরে মাছ ধরা একটি জনপ্রিয় ব্যাপার। দেশের মতো জাল ফেলে মাছ ধরাটা এখানে নিষিদ্ধ। স্পোর্টস ফিশিং-এ একমাত্র ছিপ ব্যবহার করা যায়। প্রাদেশিক গর্ভনমেন্টের কাছ থেকে সেই জন্যও লাইসেন্স করতে হয়। বাৎসরিক লাইসেন্স। ফি খুব বেশী নয়; কিন্তু লাইসেন্স ছাড়া মাছ ধরতে গিয়ে ধরা পড়লে বেশ বড়সড় জরিমানা হতে পারে। আমার এক বন্ধুকে একবার ১৩০ ডলার জরিমানা দিতে হয়েছিলো। তার লাইসেন্স কেনা ছিলো; কিন্তু সাথে ছিলো না। এখানে মৎস শিকারের বিস্তর নিয়ম কানুন। কি মাছ কখন ধরা যাবে, ক'টি ধরা যাবে, কোন সাইজের ধরা যাবে এবং কোন এলাকায় ধরা যাবে তার বিস্তারিত চার্ট আছে। নিয়মের অন্যথা যে অবিরাম হচ্ছে না তা নয়, কিন্তু ধৃত হলে পরিস্থিতি প্রীতিময় হয় না।

এতোসব ঝক্কি-ঝামেলা মাথায় নিয়েও স্বদেশে থাকতে যে সব বঙ্গনরেরা কখনো নদী-নালা-খাল-বিলের ধারে কাছেই হয়তো কালে ভদ্রে গেছেন, মাছ ধরাতো দূরের কথা, তারাও মাছ ধরার নানান সাজ-সরঞ্জাম কিনে দিব্যি মাছুয়া বনে গেছেন। তাদের শ্বাসে মাছ, আলাপে মাছ, সঙ্গ মাছ, স্বপ্নে-দুঃস্বপ্নে মাছ। দুর্ভাগ্যবশত আমিও ইদানীং তাদের দলে নাম লিখিয়েছি। দুর্ভাগ্য আমার ততখানি নয়; কিন্তু আমি মৎস্য শিকারে যাবো শুনলেই যার মধুর বদনে মেঘের ঘনঘটা দেখা দেয় তিনি আমার রূপসী অর্ধাঙ্গিনী। মাছ নিয়ে ঘরে ফিরলে তার যন্ত্রণাদায়ক কটুক্তির হাত থেকে অল্পে রেহাই পাওয়া যায়, খালি হাতে এলে জীবন রাখা দায়। গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মতো রয়েছে জাকি ও ফার । খালি হাত দেখলে তারাও তান্ডব নৃত্য শুরু করে - আব্বু মাছ পায় নাই, হে হে ..... যেমন মা, তেমন ছেলেমেয়ে!

টরোন্টো আমেরিকান বর্ডারের খুব কাছাকাছি অবস্থিত। ওপার থেকে বন্ধু-বান্ধবেরা সুযোগ পেলেই বেড়াতে চলে আসে। যাদের মাছ ধরার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ আছে কিন্তু তেমন ব্যুৎপত্তি নেই তাদের আগ্রহই আকাশচুম্বী। তাদের অনেকেরই ধারণা, এই পারে পানিতে বড়শি ফেললেই টপাটপ দশসেরি মাছগুলি আকুম-বাকুম করে সেগুলো গিলে ফেলে। আমার বন্ধু সালেহ তেমন একটা বদ্ধপরিকর ধারণা নিয়েই তিন-চার দিনের ছুটি নিয়ে বেড়াতে এলো। সে, তার মুখরা স্ত্রী রেখা এবং আট বছরের অতিশয় পরিপক্ক পুত্র জসিম।

রেখা মাছ ধরা দুই চক্ষে দেখতে পারে না। তার আগ্রহ যাবতীয় 'শপিং মল' (Shopping Mall) এর প্রতি। এলাকার সকল 'মল' (mall) এর নাম ঠিকানা তার মুখস্থ। বছর দুয়েক এই শহরে আছি, বাড়ীর পাশের ছোট 'মল'টি ছাড়া অন্য কোথাও তেমন যাওয়া পড়ে না। শিলির কেনা-কাটায় আগ্রহ অন্যান্য মহিলাদের তুলনায় নিতান্তই অল্প। বাঁচোয়া। 'মল' এ গেলেই আমার দুচোখ ভরে ঘুম আসে। এমন বিরক্তিকর জায়গা বোধহয় পৃথিবীতে দুটি নেই। শুধু মেয়েগুলিকেই দেখি চোখ মুখ উজ্জ্বল করে ছুটাছুটি করছে। তাদের পিছু পিছু ছেলেগুলো রোবটের মতো হাঁটে, আমার মতো। রেখার অনেক অনুযোগ-উপযোগ অগ্রাহ্য করে সালেহ মনস্থির করলো পরদিন সে আমার সাথে মাছ ধরতে যাবে। রেখার যদি কোথাও যেতে ইচ্ছে হয় সে গাড়ী নিয়ে যেতে পারে। সালেহ আমার গাড়ীতে যাবে। তার পুত্র বাবা বলতে অজ্ঞান। সেও পণ ধরলো বাবার

সাথে যাবে। তারও নাকি ভয়ানক মাছ ধরবার শখ। অল্পবয়স্ক একটা ছেলেকে সারাদিনের জন্য মাঠে-ঘাটে টানাটানি করে বেড়াতে আমার দ্বিধা হচ্ছিলো; কিন্তু পিতা-পুত্রের আনন্দের বহর দেখে নিষেধ করতে সাহস হলো না।

রেখার ব্যাপারটা পছন্দ হলো না। সে মনে কথা রাখারও মানুষ না। মুখ ঝামটা দিয়ে, চোখ মুখ বাঁকিয়ে বিকৃত কণ্ঠে বললো – "আমার মামা এতো বড় ফিশারম্যান, গতবার টরোন্টো এসে খালি হাতে ফিরে গেছে। আর উনি চল্লেন দুধের ছেলেকে নিয়ে। হাতি ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল!"

জসিম তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ করলো, "বাজে কথা বলবে না, মা।"

"তুই চুপ কর। আমার মুখের উপর কথা বলিস!"

জসিম এবং তার বাবা সহিষ্ণুতার পরকাষ্ঠা দেখিয়ে পরস্পরের সাথে চোখাচোখি করলো। তাই দেখে রেখা আরো তেঁতলো। পরবর্তী ঘন্টা খানেক চললো তার কথার তুবড়ি। আমাদের পরিকল্পনার তাতে কোন পরিবর্তন হলো না।

শুক্রবার সকাল। সালেহ আসবে বলে আগেই ছুটি নিয়ে রেখেছিলাম। কোন রকমে নাস্তা সেরে আমরা তিনজন বেরিয়ে পড়লাম। রেখা মুখ বাঁকিয়ে বললো, "দেখবো কি রাক্ষস- খোক্কস ধরে আনা হয়। অকর্মার দল!"

শিলি মুচকি হেসে জোট পাকালো, "খালি হাতে ফিরলে ঝাঁটা পেটা হবে।"

রেখা তীব্রতর। –"নারকেল পাতার কাঠির ঝাঁটা। একটাও মাটিতে পড়বে না।"

টরোন্টোর ভেতরে মাছ ধরবার জায়গা খুব বেশী নেই। লেক ওন্টারিওতে বোটে করে অনেকেই মাছ ধরে; কিন্তু তীর থেকে ধরার মতো মোক্ষম জায়গার যথেষ্ট অভাব। বাংলাদেশীদের অধিকাংশেরই বোট নেই। ফলে তাদেরকে এক-দুই ঘন্টা গাড়ী চালিয়ে শহরের বাইরে যেতে হয়। কানাডা হচ্ছে লেকের দেশ। চারদিকে হাজার হাজার ছোট বড় লেকের সমারোহ। সেই সব লেকে নানান জাতের মাছের বসবাস। এক এক লেকে এক এক ধরনের মাছের ভীড়। আগেই ঠিক করতে হয় কি ধরনের মাছ ধরতে আগ্রহী। সেই হিসাবে গন্তব্য স্থির করতে হয়।

সালেহ সেই সিদ্ধান্ত আমার উপরেই ছেড়ে দিয়েছিলো। তার উদ্দেশ্য মাছ ধরা। বড় হলে ভালো, ছোটতেও আপত্তি নেই। শুনেছে টরোন্টোর বাংলাদেশী মাছুয়ারা বিশাল বিশাল রুই মাছ ধরে থাকেন। তেমন একটা বড়শিতে গাঁথতে পারলে বিশেষ তৃপ্তি হতো। রেখার নাকের ডগায় মাছটাকে তিনপাক নাচানো যেতো। 'মামা মামা' বক্তৃতা একটু কমতো। কয়েকদিন আগেই অন্য এক স্থানীয় বন্ধুর সাথে গিয়েছিলাম পিটারবরোতে। সেখানে বেশ কিছু মাছ ধরবার জায়গা আছে। আমরা গিয়েছিলাম একটি স্বল্প ব্যবহৃত জায়গায়। আমাদের চোখের সামনে এক শ্বেতাঙ্গ মাছুয়া টপাটপ দুটি বিশালকায় রুই মাছ ধরে এবং ছেড়ে দিয়ে রক্তে মাতঙ্গ তুলে দিয়েছিলো। দুর্ভাগ্যবশত সারাদিন মাথা খুঁটেও আমরা আর কোন রুই মাছের সন্ধান পাইনি। কিন্তু ভাগ্য কখনো স্থির থাকে না। আজ যেখানে ঝমাঝম বৃষ্টি, কাল সেখানে ফকফকা রোদ। অনেক আশায় বুক বেঁধে সেখানেই নিয়ে চলেছি সালেহকে। অন্য একটা কারণও আছে। ঐ লেকে রুই মাছ ছাড়াও প্রচুর 'ব্যাস', 'রক ব্যাস' এবং 'সানফিস' আছে। বড় কিছু না পেলেও এক ঝাঁক ছোট মাছ নিয়ে গেলেও মুখ রক্ষা হবে।

টরোন্টো থেকে পিটারবরো প্রায় শ'দেড়েক কিলোমিটার পথ। কিন্তু অধিকাংশই ফ্রিওয়ে হওয়ায় বেশ দ্রুত গাড়ী চালিয়ে যাওয়া যায়। আমরা সোয়া এক ঘন্টার মধ্যেই গন্তব্যে পৌঁছে গেলাম। ছোট ছিমছাম শহরটার ভেতর দিয়ে পাঁচ ছয় কিলোমিটার গেলে তবে রিভারভিউ পার্ক এন্ড জু। খুবই মনোরম পরিবেশে গড়ে উঠা একটি চমৎকার পার্ক। বেশ বড়সড় একটা জু রয়েছে পার্কটার মধ্যে। আছে বাচ্চাদের প্লে গ্রাউণ্ড, ট্রেন রাইড। পাহাড়ের শরীর বেয়ে নেমে যাওয়া পীচ ঢালা রাস্তা ধরে গাড়ী চালিয়ে নীচে নামতে লেকের পাশে প্রশস্ত সমতল। সেখানে বেশ কয়েকটি 'পিকনিক এরিয়া'। ছায়া নিবিড়, সুশীতল। এখানে এলে যে কারোরই মন ভালো হয়ে যাবে। আজ শুক্রবার হওয়ায় মানুষজন অল্পই নজরে এলো। সাপ্তাহিক ছুটি শনিবার ও রবিবার। কিছু বুড়াবুড়ি আর ছেলেমেয়েসহ কয়েকজন মাঝবয়সী মহিলাকে হাটাহাটি করতে দেখলাম।

আমরা সময় নষ্ট না করে আমাদের 'সমরাস্ত্র' বের করে লেকের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। পার্কিং লট থেকে কয়েকশ' গজ দূরে মাছ ধরবার একটি মোক্ষম জায়গা আছে। লেকটা ছোট। অন্যপাশে বাড়ীঘর আছে। তীরে যেন ভাঙন না ধরে সেই জন্যে কিছু অংশে কংক্রিট দিয়ে তল বাঁধাই করে দেয়া হয়েছে। দু'দিকের তীরেই বিশাল বিশাল পাথর দিয়ে ভাঙন সম্পূর্ণ বন্ধ করবার চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা সেই পাথরের চাঙড়ের উপরেই অবস্থান নিলাম। জসিমকে বড়শির মাথায় কেঁচো গেঁথে 'রক ব্যাস' ও 'সানফিশ' ধরতে লাগিয়ে দিয়ে আমরা রুই মাছের সাজ-সরঞ্জাম করতে লাগলাম।

রুই মাছের প্রিয় খাদ্য হচ্ছে ভুট্টা। অধিকাংশ মানুষই 'সুইট কর্ণ' (sweet corn) ব্যবহার করে রুই মাছ ধরতে; বড়শির মধ্যে চার পাঁচটা দানা গেঁথে দেয়া যায়। আবার কর্ণ মিল (corn meal) ব্যবহার করে ছোট ছোট গোল্লা বানিয়ে তার মধ্যে বড়শিটাকে রোপন করা যায়। দুটোই কাজ দেয়। আমরা 'কর্ণ' নিয়ে এসেছিলাম। সেদিন শ্বেতাঙ্গ ছেলেটিকে এভাবেই ধরতে দেখেছিলাম। আমি নিজে বড় বড় স্যালমন ধরলেও রুই মাছ আজও ধরিনি। ধরবার চেষ্টাও তেমন করিনি। ইচ্ছা আছে আজ একটা বড়সড় দাও মারা। তাতে যে শুধু গৃহেই ইজ্জত বাড়বে তা নয়, বন্ধু বান্ধবের কাছেও বেশ তারিয়ে তারিয়ে গল্প করা যাবে।

কিন্তু রুই মাছ ধরার অনেক কারসাজি আছে। তারা ঘোরাফেরা করে একেবারে তল ঘেষে। সুতরাং বড়শি ফেলতে হয় এমনভাবে যেন একদম তলে গিয়ে স্থির হয়। সেই জন্যে ব্যবহার করতে হয় ওজনের মাপ। ঢেউ বেশী হলে ওজন বেশী, কম হলে অল্প। আজ সামান্য বাতাসের ঝাপটা আছে, ফলে ঢেউটা একটু বেশীই। আমরা একটু ভারী ওজন ব্যবহার করবার সিদ্ধান্ত নিলাম। ওজনটা লেকের তলায় গিয়ে নোঙরের মতো বসে থাকবে, বড়শিটা নিকটেই নিরীহ ভঙ্গিতে মাটিতে শয্যা নেবে। রুই মাছের চোখে পড়লে গপ্ করে গিলবে, ছিপের ডগায় নড়াচড়া দেখে আমরা সজোরে দেবো টান, বড়শি যাবে বাছাধনের মুখে গেঁথে, তারপর মৎস্য বাবাজীকে খেলিয়ে খেলিয়ে ডাঙায় তোলা। কঠিন কিছুই নয়। আমরা ওজনসহ বড়শিটাকে বেশ গভীরে ছুঁড়ে দিলাম। টুপ করে তলিয়ে গেলো সেগুলো। ছিপ দুটোকে পাথরে চাপা দিয়ে দু'খানা চেয়ারে আয়েস করে বসলাম। রুই মাছ হচ্ছে ধৈর্যের খেলা। শুনেছি সারাদিন নিষ্ফল বসে থেকে সন্ধ্যার সময় পরপর চার পাঁচটি ধরেছেন অনেকে। সবই ভাগ্য। দেখা যাক আমাদের নসীবে কি আছে।

জসিমের বড়শিতে একটি সানফিশ আটকিয়েছে। সে তারস্বরে চিৎকার করতে লাগলো। আনন্দে না আতংকে ঠাহর করতে না পেরে দৌড়ে গেলাম দুই বন্ধু। দেখা গেলো জসিম মাছ ধরা পড়ায় আনন্দিত হলেও মাছ ছোঁবার ব্যাপারে

আতংকিত। আমি সাবধানে ছোট মাছটিকে বড়শি থেকে ছাড়িয়ে মাছ জিইয়ে রাখার বিশেষ ঝাঁঝরিতে ঢুকিয়ে লেকের পানিতে ডুবিয়ে রাখলাম। ঝাঁঝরির হ্যান্ডেলে একটি রশি দিয়ে বেঁধে বিশালাকৃতির একটা পাথরের সাথে আটকিয়ে দিলাম। সারাদিন শেষে ঘরে ফেরার সময় ঝাঁঝরির ভেতর থেকে মাছগুলিকে বের করে নিয়ে যাবো। পানিতে থাকায় মাছগুলি মরবে না।

সামান্য অপেক্ষাতেই বিরক্ত হয়ে পড়লাম আমরা। সালেহ বললো – "মাছ টান দিলে তো দেখবই। ততক্ষণ না হয় রক ব্যাস বা সানফিশ ধরি। কি বলিস?"

আমি গলা পরিষ্কার করি। মাছ ধরার লাইসেন্সের সাথে আছে পূর্ব নির্ধারিত নিয়ম-কানুন। পানিতে একটার বেশী ছিপ ফেলানো নিয়ম বিরুদ্ধ। জরিমানা হবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু আমরা অনেকেই এতো দূর থেকে আসি যে সেই নিয়ম মেনে চলা দুষ্কর হয়ে পড়ে। দুই ঘন্টা ড্রাইভ করে, এতোগুলি টাকার তেল পুড়িয়ে, সময় নষ্ট করে কে চায় শূণ্য হাতে ঘরে ফিরতে। সবাই সাথে করে একাধিক ছিপ নিয়ে আসে। একটাকে বড় মাছের জন্য বসিয়ে দিয়ে অন্যগুলি দিয়ে অন্যান্য মাছ ধরবার চেষ্টা করে। কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব করে আমরাও জসিমের সাথে এক কাতারে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমাদের মাছের ঝাঁঝরি টপাটপ ভরতে লাগলো। মাঝে মাঝে আড় চোখে পেতে রাখা ছিপগুলোকে পর্যবেক্ষণ করছি। যদিও পাথর চাপা দেয়া আছে, তবুও কিছু বলা যায় না। শুনেছি রুই মাছ নাকি ভয়ানক টান দেয়। ছিপের পিছু পিছু ধাওয়া করবার ঘটনাও শুনেছি। কে ভেবেছিলো আমাদের কপালেই যে সেই শনি ভর করবে।

ব্যাপারটা প্রথম খেয়াল করলো জসিম। সে তারস্বরে চিৎকার করে উঠলো- "আঙ্কেল, তোমার ছিপ নড়ছে! দেখো, দেখো!"

তাকিয়ে দেখলাম বাস্তবিকই তাই। আমার ছিপের ডগাটা বেতস পাতার মতো দুলছে। নির্ঘাত মাছ ধরেছে। আমি হাতের ছিপ ফেলে পড়িমড়ি করে দৌড় দিলাম। বোধহয় ফুট দশেকও যাই নি, আমার চোখের সামনেই জলজ্যান্ত ছিপটা পাথরটাকে এক ঝটকা মেরে সরিয়ে দিয়ে পানিতে ডাইভ দিলো। আমি জামা কাপড়ের মায়া ভুলে ছুটলাম ছিপের পেছনে। ধরি ধরি করেও ধরতে পারলাম না। আমার আঙুলের ডগায় মোলায়েম একটি ধাক্কা দিয়ে গভীর পানিতে অদৃশ্য হয়ে গেলো সেটা। আমি আধ কোমর পানিতে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। ষাট ডলারের নতুন ছিপ, রুই মাছ ধরবো বলে কিনেছিলাম। সবসুদ্ধ গেলো!

সালেহ দৌড়ে এসে তার নিজের ছিপখানা সজোরে চেপে ধরলো। জীবন গেলেও তার ছিপ যে যাবে না সে ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আমি ভাঙা বুক নিয়ে পাথরের উপরে ধপাস করে বসে পড়লাম। জসিম কানের পাশে ভয়ানক উত্তেজিত গলায় বাংলা ইংরেজি মিশিয়ে কথার তুবড়ি ছোটাচ্ছে। এমন চরম উত্তেজনাকর ঘটনা সে জীবনে দেখেনি। ছিপটা যেন রকেটের মতো ছুটে গেলো। মাছটা নির্ঘাত ১০০ পাউন্ডের হবে। ইচ্ছে হচ্ছে ঝেড়ে একটা ধমক দেই। কিন্তু বেচারি ছেলেমানুষ। মাথায় হাত দিয়ে ষাট ডলারের জন্য আফসোস করতে থাকি। তখনও যদি জানতাম কপালে আরো কত ভোগান্তি আছে!

সাথে খাবার-দাবার নিয়ে এসেছিলাম। কিছু চিকেন স্যাণ্ডউইচ আর প্রচুর ফলমুল। পেটে কিছু খাবার পড়তে শোক খানিকটা কমলো আমার। আবহাওয়া বেশ গরম। প্যান্টটাও মোটামুটি শুকিয়ে এসেছে। মাছ ধরায় অবশ্য তেমন সুখকর কিছু ঘটেনি আর। সালেহের ছিপখানা তার দুই হাতের মুঠির মধ্যে নির্জীবের মতো বসে আছে গত ঘন্টা খানেক ধরে। মাছের নাম গন্ধ নেই। রোদের তাপ বেড়ে যাওয়ায় ছোট মাছগুলোও আরেকটু গভীর পানিতে সরে গেছে। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম স্থান পরিবর্তনের। লেকের তীর ধরে আরো শ'খানেক গজ সরে গিয়ে কিছুটা ফাঁকা জায়গা পাওয়া গেলো। অতিরিক্ত গাছপালা থাকলে বড়শি থ্রো করা যায় না, ডাল-পালায় আটকিয়ে যায়। সে আরেক যন্ত্রণা। আমি সাথে তিন চারটা ছিপ রাখি। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আরেকটিকে সযত্নে টোপ পরালাম। যতখানি সম্ভব জোরের সাথে ছুড়ে দিলাম গভীর পানির দিকে। খা, বককিলারে খা!

সালেহও আমাকে অনুসরণ করে বড়শি ফেললো পানিতে। বুদ্ধি করে আমরা জসিমেরটাও পানিতে ছুড়লাম। পানিতে যতগুলি বড়শি থাকবে, মাছ ধরবার সম্ভাবনা তত বেশি। মিনিট দশেকের মধ্যে আবিষ্কার করলাম আমাদের তিনটি ছিপের বড়শি, সুতা সব পানির নীচে জট পাকিয়ে একটা বিশ্রী অবস্থার সৃষ্টি করেছে। আমাদের সবার মুখেই অন্ধকার নেমে এলো। এ কি যন্ত্রণায় পড়া গেলো? সুতা কেটে নতুন করে সাজ সজ্জা করতে হলো। আমি সালেহের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইলাম, সেও আমাকে একটি সংকল্প-দৃঢ় চাহনি দিলো। মাছ পাকড়েঙ্গেতো ঘরমে যায়েঙ্গে। টরোন্টোতে হিন্দি ভাষাভাষির ছড়াছড়ি, তবুও ভাষাটা রপ্ত করতে পারিনি।

নতুন আশায় বুক বেঁধে আবার পানিতে ছুঁড়লাম বড়শি। এবার জসিমের ছিপটাকে বিরাম দেয়া হলো। দুপুর গড়িয়ে বিকেল চলে এসেছে। সন্ধ্যা হবার আগেই কাটতে হবে। পার্কের গেট বন্ধ হয়ে যেতে পারে। হাতে সময় বেশী নেই। মাছ একটা ধরতেই হবে। ছিপের শেষ মাথা ধরে সটান দাঁড়িয়ে থাকলাম আমরা। পারলে এবার টান দিয়ে নিয়ে যা তো বাপ্। তুমি ঘুঘু দেখেছো ফাঁদ দেখনি। তুমি থাকো ডালে ডালে, আমি থাকি পাতায় পাতায়। এমনি নানান জাতীয় কথাবার্তা ঘুরছে মাথার মধ্যে। কোনো মাছের বিরুদ্ধে এমন রোষ এর আগে কখনো অনুভব করিনি। ষাট ডলারের ছিপ! পুরো টাকাটাই যথার্থই পানিতে গেলো।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাদের সতর্কতায় ভাঙন দেখা দিলো। নির্বিকার মুখে কতক্ষণ আর পানির দিকে ঠায় চেয়ে থাকা যায়? জসিম বিরক্ত হয়ে উঠেছে। সে বাসায় ফিরতে চায়। আমি এবং সালেহ তাকে পালা করে ধমকাচ্ছি। কোন বাসায় যাওয়া-টাওয়া হবে না। রুই না ধরে কোন আলাপ নেই। বেচারি বিরক্ত হয়ে অস্থির ভঙ্গিতে মাঠময় হাঁটাহাঁটি করছে। আমরাও শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত ভঙ্গিতে ছিপ দুটোকে কোলের উপর রেখে মাটিতেই বেশ আয়েস করে বসে পড়লাম। বিকেলের মৃদু বাতাসটা বেশ শান্তির আমেজ নিয়ে এলো। পাতার ঝির ঝির শব্দটাও খুব ভালো লাগছে। টাকার শোকটা প্রায় ভুলে এসেছি এমন সময় খেয়াল করলাম সালেহ তড়াক করে লাফিয়ে উঠে সটান পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমি চিৎকার করে বললাম - মাছ? মাছ?

সালেহ ছিপের শেষাগ্রটা একহাতে ধরে ফেলেছে কিন্তু মোক্ষম ভাবে ধরতে পারেনি। আমার মনে হলো মাছটা তাকে সহ ছিপটাকে নিয়েই বুঝি পানিতে উধাও হবে। আমি সাঁতার জানি না। সাথে সেজন্যে লাইফ জ্যাকেট রাখি সব সময়। আজ

সেটাকে ডাট মেরে গাড়ীতেই রেখে এসেছি। তবুও সাহস করে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সালেহের পা চেপে ধরলাম। কোমর সমান পানিতে হাবু-ডুবু খেতে খেতে লক্ষ্য করলাম সালেহ দু'হাত বাগিয়ে ছিপটাকে ধরতে পেরেছে। আমি তাকে ছেড়ে দিয়ে হেঁচড়ে পেঁচড়ে তীরে এলাম।

সালেহের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ শোনা গেলো – "সূতা ছিঁড়ে নিয়ে ফুটলো রে। বিশ পাউন্ডের সুতা। নির্ঘাত আধমনি মাছ।"

জসিম চিৎকার করছে – "একশ পাউন্ড! একশ পাউন্ড! আমি নিজের চোখে দেখলাম। ঐ যে ঐখানে। ছয়ফুট লম্বাতো হবেই ..."

রুই মাছ সাধারণত দল বেঁধে আসে। আমি ভিজে ছপছপে হয়ে মাত্র ডাঙ্গায় উঠেছি, এক ঝটকা টানে আমার ছিপটাকে নিয়ে পালানোর মতলব করতে দেখলাম আরেক ভদ্রমৎসকে। চিন্তা করবার অবসর নেই। গোলি যেভাবে পেনাল্টি ঠেকানোর জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে সেভাবে সমস্ত শরীর শূন্যে উঠিয়ে ঝাঁপ দিলাম। খপাত করে ছিপটা ধরে টান দিলাম। এই টানেই বড়শিটা মিঃ রুইয়ের মুখে আচ্ছাসে গেঁথে যাবে। মন্দ কপাল। সালেহের মতো আমারও সুতা ছিঁড়লো। আমারটার ছিলো বারো পাউন্ডের সূতা। বিশ পাউন্ডই টিকলো না আর বারো! আমি কিঞ্চিৎ স্বস্তি পাই।

আমাদের ঘাড়ে বোধহয় ভূত চেপেছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে কিন্তু ফিরে যাবার আগ্রহ কারোরই নেই। আবার বড়শি পানিতে ফেলে প্রতীক্ষার প্রহর গুনছি দুই বন্ধু। চারদিকের আলো ধীরে ধীরে কমে এসেছে। পানির উপরে দৃষ্টি বেশীদূর চলছে না। জসিম বেশ কিছুক্ষণ ধরেই চিৎকার, কান্না-কাটি থেকে শুরু করে পুলিশ ডাকবার হুমকি দিচ্ছে। তাকে আমরা সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করছি। আমার অবশ্য একটু দুঃশ্চিন্তা হচ্ছে। পার্কটির পিকনিক এরিয়া অন্ধকার হলে বন্ধ হয়ে যায়। গতবার এতো দেরি করিনি। গেট বন্ধ হয়ে গেলে গাড়ী নিয়ে বের হবো কিভাবে?

সালেহের কাছে আমার উদ্বেগটা প্রকাশ করতে সেও গম্ভীরভাবে ঘাড় দোলালো। – "ঠিক বলেছিস। ঝামেলা হবে। চল ফিরেই যাই। মাছ যে কিছুই পাইনি, তাতো নয়। এক ঝাঁঝরি ভর্তি ছোট মাছ আছে।"

আমিও সায় দেই – "ঠিকই বলেছিস। মাছ ধরা হচ্ছে কপাল। সব দিন কি আর একরকম যায়। ছিপ তোল্। চল্, ফিরি।"

জিনিসপত্র সব গুছিয়ে ফিরবার পথে পানি থেকে ঝাঁঝরি তুলতে গিয়ে আরেকটি অনভিপ্রেত ব্যাপার আবিষ্কার করলাম। তারের জালির ঝাঁঝরির একটা পাশ ছিঁড়ে গিয়ে সমস্ত মাছ ছুটে গেছে। শূণ্য ঝাঁঝরি হাতে আমরা কয়েকটা মুহূর্ত হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকলাম। এমনকি জসিমের মুখের কথাও ফুরিয়ে গেছে মনে হলো। সালেহ ভেজা প্যান্ট থেকে পানি ঝাড়ার চেষ্টা করতে করতে উদাস গলায় বললো – "একেবারে খালি হাতে ফিরলে সর্বনাশ হবে রে! মামার কেচ্ছা শুনতে শুনতে জীবনটা বের হবে।"

জসিম চিন্তিত মুখে সায় দিলো। -"হ্যাঁ আঙ্কেল। মা অনেক যন্ত্রণা দেবে।"

আমি ঘড়ি দেখি। সাড়ে সাত। টরোন্টোর চাইনিজ গ্রোসারি ষ্টোরগুলো জ্যান্ত রুই মাছ বিক্রি করে। বড় বড় পানির ট্যাংক থেকে যে কোনোটা পছন্দ করে নেয়া যায়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ন'টার মধ্যে দোকান বন্ধ হয়ে যায়। যদি তার আগে শহরে ঢোকা যায় তাহলে হয়তো এই যাত্রা রক্ষা পাওয়া যায়। সালেহকে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে তার মুখে অনুপম হাসি ফুটে উঠলো।

পাহাড়ি পথ বেয়ে গাড়ী চালিয়ে উপরে উঠতে উঠতে আবিষ্কার করলাম, যা ভয় পেয়েছিলাম তাই-ই হয়েছে। রাস্তা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে লোহার গেটটা।

জসিম চিৎকার করতে লাগলো- "আগেই বলেছিলাম। বলেছিলাম কিনা? ছোটদের কথা শোন না? এখন কি হবে?"

সালেহের মুখও ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। সেই কোন বোস্টন থেকে এতো পথ ঠেঙ্গিয়ে এসে এমন নাস্তানাবুদ হবে কে ভেবেছিলো। আমি মাথা ঠান্ডা করে চারদিকে চোখ বোলাতে লাগলাম। কোথাও কেউ নেই। অন্য কোন উপায় না পেলে পুলিশকেই ডাকতে হবে। হঠাৎ খেয়াল করলাম গেটের ঠিক পাশ ঘেষে একটা কংক্রিট বাঁধানো পায়ে চলা পথ। দু'পাশেই কংক্রিটের দেয়াল। হিসাব কিতাব করে দেখলাম সাইড মিরর দু'টাকে ভাঁজ করলে হয়তো নিরাপদে পেরিয়ে যাওয়া যাবে। হাতে সময় নিতান্তই কম। ন'টার আগে টরোন্টো পৌঁছাতেই হবে। পুলিশ ডাকার অর্থ হচ্ছে আধা ঘন্টা যাবে। আমি চেষ্টা করারই সিদ্ধান্ত নিলাম। ইঞ্চি ইঞ্চি করে বেরিয়ে এলাম গেটের অন্যপাশে। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। অপেক্ষা করার সময় নেই। গাড়ী ছোটালাম দুরন্ত বেগে।

রাত দশটার দিকে যখন বাসায় পৌঁছলাম, রেখা বাঁকা একটুকরো হাসি দিয়ে মোক্ষম কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো। আমরা দু'জন দু'টি মাঝারি আকারের রুই মাছ তার নাকের ডগায় ঝোলাতে লাগলাম। সে মুখ বাঁকালো, "আমার মামার তিন বছরের ছেলেটাও এর চেয়ে বড় বড় মাছ ধরে।"

সালেহ স্ত্রীর নজর বাঁচিয়ে চোখ টিপলো। রেখা জব্দ হয়েছে। জসিম ঠিক তার পেছনে দাঁড়িয়ে বাবাকে সমানে খোঁচা দিচ্ছে। মাছ কেনার রহস্য গোপন রাখানোর জন্য তার সাথে সালেহকে বিশেষ চুক্তি করতে হয়েছে। তার পছন্দসই একটা ভিডিও গেম তাকে কিনে দেয়া হবে। সে বাবাকে শর্তটা ভুলে যাবার যে সুযোগ দেবে না তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

বন্ধু চলে যাবার তিন দিন পর অফিস থেকে বাড়ি ফিরতেই ঠিক মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো স্ত্রী সাহেবান। নাকের ডগায় নাড়াতে লাগলো চাইনিজ দোকানের রিসিটটা।

আমি মুখ ব্যাজার করলাম – "কি চাই? শপিংএ যাবে?"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ি। বন্ধুদের জন্য মানুষ কত স্বার্থ ত্যাগ করে, আর এতো সামান্যই!

শীত প্রধান দেশগুলোতে মাস ছয়েক শীতে কাঁপাকাঁপি করে যখন শেষ পর্যন্ত গ্রীষ্ম আসে তখন চারদিকে যেন একটা উৎসবের আমেজ চলে আসে। বিশেষ করে আমরা যারা গরম প্রধান এলাকা থেকে এসে এখানে সংসার পেতেছি তাদের কাছে গ্রীষ্ম হচ্ছে পরিত্রাণ। খুব দীর্ঘদিনের জন্য নয়, তবুও নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।

গ্রীষ্মে বাংলাদেশীদের প্রিয় কর্মকান্ডের দু'টি হচ্ছে পিকনিক ও মাছ ধরা। এখানে অজস্র ন্যাশনাল, প্রভিনসিয়াল এবং লোকাল পার্ক আছে। কিছু পার্কে ফি দিয়ে ঢুকতে হয়, কতগুলো ফ্রি। প্রায় প্রতিটিই প্রাকৃতিক পরিবেশ মনোরম। বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে সারাটা দিন বেশ হাসি খুশীতে কাটানো যায়। অনেকগুলিতেই লেক আছে। বাচ্চারা লেকের তীরের বালুতে খেলতে অসম্ভব পছন্দ করে। আমি সাঁতার না জানলেও স্বল্প গভীর পানিতে হাত পা আছড়িয়ে প্রচুর আনন্দ পাই। আমার ব্যক্তিগত আগ্রহেই প্রায় প্রতি গ্রীষ্মেই প্রচুর পিকনিক হয়ে থাকে।

নায়েগ্রা ফল্‌সে কখনো এই উদ্দেশ্য নিয়ে যাই নি। কিন্তু গ্রুপের বেশ কয়েকজন আগ্রহ দেখানোয় ইতিবাচক সায় দিলাম। নায়েগ্রা জলপ্রপাতকে ঘিরে গড়ে উঠেছে দুটি শহর। একটি নায়েগ্রা ফল্‌স্ আমেরিকা, অন্যটি নায়েগ্রা ফল্‌স্ কানাডা। আমরা কানাডার দিকেই থাকবো। পিকনিকের জায়গা আছে কিনা কেউই সে ব্যাপারে ওয়াকিবহাল নয়। তবে ধারণা করা হলো সেখানে গিয়ে পার্ক জাতীয় কিছু একটা নিশ্চয় পাওয়া যাবে। সেখানেই থেমে সকলে খাওয়া দাওয়া সেরে ফেলে নায়েগ্রা জলপ্রপাতের কাছে চলে যাবো। ঠিক হলো খাবার দাবার বাসা থেকেই নিয়ে যাওয়া হবে। সাধারণত পিকনিকে গেলে আমরা বারবিকিউ চুলা সাথে নিয়ে যাই। যুতসই মতো জায়গায় আসন গেড়ে রান্নাবান্নায় লেগে যাই। এইবার তার অন্যথা হলো। আমরা পাঁচটি পরিবার যাবো । মোট চারটি ভ্যান, একটি কার। একদল দায়িত্ব নিলো খিঁচুড়ি এবং সালাদের। অন্যদল ভুনা গরুর গোশত। ঠিক হলো পাঁচটি গাড়ি সারি বেঁধে যাবে। ভালো জায়গা পেলে সেখানে থেমে ভুরিভোজন সারা হবে।

রওনা দিতে দিতেই দুপুর হয়ে গেলো। প্রায় সবারই একাধিক বাচ্চা-কাচ্চা। তাদেরকে সাজিয়ে গুজিয়ে, প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র বেঁধে ঘর থেকে বের হতে সময় নিতান্ত কম লাগে না। দেরিতে বের হবার প্রধান অসুবিধা রাস্তায় গাড়ির ভিড় হয়ে যায়।

হাইওয়ে ৪০১ এ আমরা পাঁচটা গাড়ি নিয়ে যখন নামলাম তখন দেড়টা বাজে। সবার অগ্রভাগে আমি, শিলি ও জাকি। আমাদের ঠিক পেছনেই সীমা, তার স্বামী মাসুম ও তিন বাচ্চা। শিলির ছোটবোনের বান্ধবী সীমা। অসম্ভব ভারিক্কী শরীর এবং ভয়ানক রসিক। তার ছেলে জনির সঙ্গে জাকির গলায় গলায় ভাব। দু'জনাই স্পাইডারম্যান বলতে অজ্ঞান।

তাদের পরের ভ্যানটি আলতাফ ভাইয়ের। স্ত্রী বিভা ও দুই ছেলে তার সঙ্গী। তাকে অনুসরণ করছেন নোমান ভাই, তার স্ত্রী ও দুই মেয়ে নিয়ে। সবশেষে বিলাল ভাই স্ত্রী রিমা ও দুই সন্তান নিয়ে তার কারে। আমাদের ছোট্ট কাফেলাটি রাস্তায় গাড়ীর ভিড় ঠেলে এগুতে থাকে নায়েগ্রাভিমুখে। আমরা সাথে নিয়েছি কিছু স্ন্যাকস, সীমা নিয়েছে খিঁচুড়ি, নোমান ভাইরা সালাদ, আলতাফ ভাইরা ভুনা গোশত এবং বিলাল ভাইরা থালা বাসন। আমার সকালে নাস্তা খাবার অভ্যাস নেই। পেটের মধ্যে ইতিমধ্যেই মোচড় অনুভব করছি।

টরোন্টো থেকে নায়েগ্রা ফল্‌স্ দেড়শ' কিলোমিটার। হাইওয়ে ৪০১ ধরে গিয়ে QEW (Queen Elizabeth Highway) নিতে হয়। পরে ৪২০ ধরে নায়েগ্রা ফল্‌স্ শহরের অভ্যন্তরে চলে যাওয়া যায়। QEW তে ওঠা পর্যন্ত সবাই একসাথেই ছিলাম। তারপরে কি হতে কি হয়ে গেলো, আমাদের কাফেলায় ভাঙ্গন ধরলো। শেষ পর্যন্ত নায়েগ্রা ফলসে যখন পৌঁছালাম তখন আমরা, সীমারা এবং নোমান ভাইরা একত্র হতে পারলাম। আলতাফ ভাই এবং বিলাল ভাইয়ের কোন খবর নেই। তাদের দুজনার কারো কাছেই মোবাইল ফোন নেই। সুতরাং হাল হকিকত জানবারও কোন উপায় নেই।

দুপুর গড়িয়েছে বেশ আগেই। সন্দেহ নেই সকলেরই উদরে গুরুম গুরুম মেঘের নিনাদ চলছে। আমরা বিস্তর চিন্তা ভাবনা করে নায়েগ্রা জলপ্রপাতের সামনে গিয়ে পার্ক করলাম। মনে কিঞ্চিৎ আশা, আলতাফ ভাই ও বিলাল ভাই হয়তো আমাদেরকে খুঁজতে খুঁজতে বুদ্ধি করে এখানে এসে হাজির হবেন। জলপ্রপাতের ঠিক শরীর ঘেষে নায়েগ্রা পার্কওয়ে। পার্কওয়ে বরাবর উঁচু রেলিং ঘেরা প্রশস্ত পায়ে চলা পথ নায়েগ্রা রিভারকে অনুসরণ করে বেশ অনেকখানি চলে গেছে। এই পথের উপরেই পরপর দু'টি ভিজিটর সেন্টার। সেখানে খাবার-দাবার এবং সুভেনিরের দোকানের ভিড়। বাইরে সারি বেঁধে চেয়ার-টেবিল পাতা আছে। আমরা সেগুলিরই কয়েকটি দখল করে বসলাম। আমাদের উদগ্রীব দৃষ্টি স্বভাবতই রাস্তার উপরে। আমাদের ভুনা গোশত ও থালাবাসন এই পথেই আসবে।

আমার শালী বলতে শিলির দু'টি মামাতো বোন, যারা সুদুর ঢাকায় বসবাস করে। সীমা বয়েসে শিলির ছোট হওয়ায় এবং ছোটকালের বন্ধুত্বের সুত্রে সেই আমার শালীর ভুমিকা পালন করে থাকে। এই মুহুর্তে সে ভয়ানক বিরক্তি নিয়ে আমাকে ঝাড়ছে। - "ভাই, আপনেরে কত কইরা শিখাইয়া দিছিলাম একটু আস্তে আস্তে চালাইয়েন। আপনেরে কি এমনে এমনে সামনে দিছিলাম। কিন্তু ফাঁকা রাস্তা দ্যাখলে আপনের কল-কব্জায় কি সমস্যাটা হয় কন দেহি? অহন কি খিঁচুড়ির হাড়িটা মাথায় নিয়া বইয়া থাকুম? "

আমি খুক খুক করে কাশি। ফ্রিওয়েতে উঠলে আমার পায়ে যে সামান্য চুলকানি হয় অস্বীকার করবার উপায় নেই। আমি নিরীহ কণ্ঠে বললাম, "চলো, আমরা না হয়, কোন রেস্টুরেন্টে খেয়ে নেই"।

"রেস্টুরেন্টে-ই যদি খামু তাইলে একহাড়ি খিঁচুড়ি ক্যান রাইন্ধা আনছিলাম? আপনের গাঙ চিলরে খাওয়েনের জইন্য। আলতাফ ভাইয়ের গাড়ির সাইডে দুই সেকেন্ডের জইন্য খাড়াইছিলাম। আহারে গুশতোটা কি বাহারী গন্ধ যে ছাড়তাছিলো। দিলেন তো সব মাটি কইরা। অহন হা কইরা পানি পড়ন দেহি আর করুম কি? পানিও পড়ুক, প্যাডের মধ্যে বোমও পড়ুক। ও মারুফার বাপ, খাড়াইয়া খাড়াইয়া আমার মুখ দ্যাহো ক্যান? যাও, খিঁচুড়ির হাড়িডা লইয়া আসো। "

মারুফা তাদের বড় মেয়ে, বয়েস সাত। অতিশয় বুদ্ধিমতী। ছোট মেয়েটার নাম সুফিয়া, তিন ছুঁই ছুঁই। বাবার কোলে তার পাকাপোক্ত আসন। জনির পিঠাপিঠি হওয়ায় তাদের সম্পর্ক যথেষ্ট ছন্দময়। মাসুম ভাই ধর্মভীরু, শান্ত স্বভাবের মানুষ। তিনি সুফিয়াকে কোলে নিয়েই পার্কিং লটে ঢুকলেন খিঁচুড়ির হাড়ি আনতে।

আমি সীমার কটুক্তির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ছেলেমেয়েগুলিকে নিয়ে রেলিঙের কাছ ঘেষে দাঁড়ালাম। এখান থেকে মনে হয় হাত বাড়ালেই বুঝি জলপ্রপাতটিকে ছোঁয়া যাবে। ঘোড়ার খুরের মতো আকৃতি নিয়ে গড়ে ওঠা জলধারাটি ২০-২২ মাইল প্রতি ঘন্টা গতিতে ছুটে এসে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ছে ১৭৩ ফুট নীচে জলধিতে। সেখানে বাষ্পের দরুন দৃষ্টি প্রায় চলেই না। চারদিকে প্রচুর গাঙচিল উড়ছে। নীচের পানিতে শুভ্র ফেনার রাশি কিলবিল করছে। একটি মাঝারি আকারের মানুষবাহী বোট বাষ্পের দেয়াল ছিন্ন করে ধীর গতিতে বেরিয়ে এলো অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ পানিতে। এতো উঁচু থেকে সেটাকে খেলনা নৌকার মতো লাগে। আমি এবং শিলি একবার এই টুরটি নিয়েছিলাম। বোটের পাটাতনে দাঁড়িয়ে, শীতল জলের ঝাপ্টায় ভিজতে ভিজতে, গগনচুম্বী জলপ্রপাতটির প্রায় অদৃশ্য অবয়ব আর ভয়ানক গুরুগম্ভীর নিনাদের অস্তিত্বকে অবজ্ঞা করে আমরা উদাত্ত ভাবে হেসে উঠেছিলাম। সেই অভিজ্ঞতা ভোলার নয়।

কোথাও বেড়াতে যাবার আগে আমি চেষ্টা করি জায়গাটা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞানার্জন করতে। নায়েগ্রার উপরে অল্প বিস্তর পড়াশোনা করেছি, মস্তিস্কে সেই তথ্যভান্ডার সঞ্চিত থাকতে থাকতেই উদগীরণ করবার ব্যগ্রতা অনুভব করলাম। শিলি এবং সীমার কটাক্ষ দেখেই বুঝলাম সেখানে বিশেষ সুবিধা হবে না। নোমান ভাই তার স্ত্রী ও কন্যা দুটিকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অদূরে অবস্থিত রেইনবো ব্রীজের দিকে চলে গেছেন। এটি নায়েগ্রা নদীর উপর দিয়ে ওপারের সাথে সংযোগ স্থাপন করেছে।

শ্রোতা বলতে মারুফা, জাকি ও জনিই ভরসা। জাকি এবং জনির ভাবভঙ্গি সুবিধাজনক নয়। তারা দুই কোমরে হাত রেখে জলপ্রপাতটিকে ভস্ম করতে করতে বললো, "আমরা তো ওয়াটারফল দেখেছি। এখন কি করবো? "

মোক্ষম প্রশ্ন। আমি বুদ্ধি করে নায়েগ্রা জলপ্রপাতের নিকটেই অবস্থিত আমেরিকান জলপ্রপাতটির অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ অবয়ব নির্দেশ করে বললাম, "ঐ টা হচ্ছে আমেরিকান ফল্‌স্। এটাতো তোমরা দেখনি।"

জাকির নির্বিকার উক্তি, "হ্যা দেখছি। ঐটা আরেকটা ফল্‌স্। অনেক ছোট।"

জনি প্রস্তাব দিলো, "জাকি আসো আমরা স্পাইডারম্যান - ব্যাটম্যান ফেলি। তুমি ব্যাটম্যান, আমি স্পাইডারম্যান।"

এই রুটিন আমার নখদর্পণে। এইবার তারা প্রথমে তর্কাতর্কি, পরে ধস্তাধস্তি এবং পরিশেষে চুল ছেঁড়াছেঁড়ি করবে। উভয়েরই স্পাইডারম্যান প্রীতি অধিক। তবে কোন এক মন্ত্রবলে শেষ পর্যন্ত তারা প্রতিবারই আপোষ মীমাংসা করে ফেলে। আমি তাদের এই রহস্যময় আনুষ্ঠানিকতায় নাক গলানো থেকে বিরত থাকি। আমি সাধারণ মানুষ, এই জাতীয় শক্তিমানদের সাথে গোলযোগে আগ্রহী নই।

আমি মারুফাকেই জ্ঞান দান করবার উদ্যোগ নিলাম। কিন্তু দেখা গেলো তার তুলনায় নায়েগ্রা সম্বন্ধীয় জ্ঞান আমার নিতান্তই হাস্যকর। তার হাতে নাস্তানাবুদ হতে হলো। তবে জ্ঞানের পরিধি বাড়লো। জানা হলো, ১৮৪৮ সালে ২৯শে মার্চে নায়েগ্রা ফল্‌স্ শুকিয়ে গিয়েছিলো। লেক ইরির পানি নায়েগ্রা নদী বাহিত হয়ে লেক ওন্টারিওতে এসে পড়ে। এক অযাচিত বাতাসের তোড়ে লেক ইরি থেকে বিশাল বরফের চাঙড় এসে নায়েগ্রা রিভারের মুখে বাধার সৃষ্টি করায় নায়েগ্রা জলপ্রপাতে পানির স্রোত এক রকম বন্ধই হয়ে যায়। পরবর্তিতে তাপমাত্রা বাড়লে বরফের চাঙড় গলে গিয়ে আবার স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরে আসে। প্রচন্ড শীতেও নায়েগ্রা জলপ্রপাত কখনো জমাটবদ্ধ হয় না। কিন্তু আমেরিকান ফল্‌স্ ক্ষুদ্র বিধায় জানা মতে বার দুয়েক সম্পূর্ণ জমাট বেঁধেছে। এটি নায়েগ্রা জলপ্রপাতের মাত্র এক দশমাংশ।

হঠাৎ সীমার এবং শিলির তীক্ষ্ণ কণ্ঠের চিৎকারে জ্ঞানের জগত থেকে শক্তিমানদের জগতে প্রবেশ করি। জাকি এবং জনি উভয়েই তাদের শার্ট প্যান্ট খুলে ফেলছে। দু'জনেরই শরীর আবৃত করে আছে স্পাইডারম্যানের বাহারী পোশাক। তারা পরস্পরকে ধাওয়া পালটা ধাওয়া করছে। বেশ কিছু রসিক ট্যুরিস্ট ভিড় করে তাদের খেলা দেখছে। আমি প্রমাদ গুনলাম। কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্রতা এবং রুষ্টতা প্রদর্শনের পরে তাদেরকে জামাকাপড় পরিয়ে বগলদাবা করে তাদের মাতৃদেবীদের কাছে দিয়ে এলাম। সেখানে মৌখিকভাবে তাদেরকে যথেষ্ট উৎপীড়নের সম্মুখীন হতে হলো। দু'জনার কাউকেই অবশ্য এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র বিচলিত মনে হলো না। ছাড়া পাবার মুহূর্তের মধ্যেই জামা কাপড় খসিয়ে তারা পুনরায় স্পাইডারম্যানের পোশাকে ফিরে গেলো।

মাসুম ভাই এই কাণ্ড দেখে খুবই নাখোশ হলেও সীমা উদার কণ্ঠে বললো - "থাউগ গিয়া। দুইডা কংকাল চামড়ার মইধ্যে সাইট্যা থাকা লাল নীল ড্রেস পইরা একডু সুই সু---ই আর যাডাং যাডাং করলে আর কি অইবো। কর, ভালো কইর‍্যা কর। তয় পানির মইধ্যে ফাল দিয়া পড়িস না। দুইশ ফুট নীচে পড়লে হাড্ডিগুলা কিমা অইবো। এই বেয়াক্কলের দল, শুনছসনি আমার কথা? "

নোমান ভাইরা ক্লান্ত ভঙ্গিতে ফিরে এলেন। তাদের মুখভাবেই বোঝা গেলো উদরে অগ্নিসংযোগ হয়েছে। নোমান ভাই একটি ম্যাকডোনাল্ডসের ম্যানেজার। তিনি চারদিকে তাকিয়ে কিঞ্চিৎ খোঁজাখুজি করে বললেন - "শুধু খিঁচুড়িতো খাওয়া যাবে না। আশে পাশে কোথাও ম্যাকডোনাল্ডস্ থাকলে খাওয়া যেতো। আমার কাছে অনেক কুপন আছে।"

তার মেয়ে দুটি সমস্বরে বললো - "হ্যাঁ, বাবা, কিড্‌স্ মিল (Kids meal) নিলে একটি করে টয় (Toy) পাওয়া যায়।"

সীমা টাটিয়ে উঠলো - "হ, এই ধুমসীরে আপনেগো ক্যালরি বোম্ খাওয়াইয়া জীবনটা শ্যাশ করেন। আপনেগো ধইরা জেলে ঢুকানো দরকার। ফিরি কুপন দিয়া আমগো শিশুর মতো মনডারে লইয়া খ্যালা করেন, লজ্জা করে না? "

সীমা কাশলেও মানুষ হাসে। চারদিকে হাসির রোল উঠলো। অন্যান্য কিছু বাংলাদেশী যারা আমাদের আশেপাশে ছিলেন তারাও দেখলাম সেই হাসিতে যোগ দিলেন। লক্ষণ খারাপ। একবার বাজার পেলে সীমার জিহ্বার ধার বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। সে এইবার আমাকে নিয়ে পড়লো। - "ভাই, আমগো ভুনা গোশ্‌ত্ তো আপনের কৃপায় নায়েগ্রার পথে পথে ঘুরতাছে, আহেন আমরা হাফুস হুফুস কইরা চাইল - ডাইলের মিক্সারটারেই সাইট্যা দেই। "

প্রস্তাবটা আদৌ গ্রহনযোগ্য নয়। চারদিকে শত শত টুরিস্ট-এর ভিড়। তার মাঝে হাড়ি থেকে সবাই মিলে খেলে জাত-ধর্ম সবকুলই যাবে।

"কি ভাই, এমন চিন্তায় পইড়া গ্যালেন ক্যান? জোক করতাছি। একটু ঠাট্টা মশকরাও বুঝেন না। মারুফার বাপ যাও খিঁচুড়ির হাড়িটা রাইখ্যা আসো।"

মাসুম ভাই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে খিঁচুড়ির হাড়ি নিয়ে গাড়িতে গেলেন। তিনি ফিরে আসতে আমরা একটি রেস্টুরেন্টেই ঢুকলাম। অনেকগুলি টাকার শ্রাদ্ধ হলো। একেতো খাবারের মূল্য টুরিস্ট এলাকা বিধায় বেশি, তারপরে রয়েছে ট্যাক্সের অত্যাচার।

পেটপুজা হতে সকলের ব্যবহার কিঞ্চিৎ নমনীয় হয়ে এলো। জলপ্রপাতকে সামনে রেখে কংক্রিটের উপরেই বসে পড়লাম আমরা, বড়দের হাতে কফি অথবা চা। আমাদের অস্থিসার স্পাইডারম্যান দু'জনের পেটে কিঞ্চিৎ খাদ্য পড়ায় তাদের চঞ্চলতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের দিকে এক চোখ রেখে আমি আমার স্বভাবসিদ্ধ নিয়মে জ্ঞানের দুয়ার খুলে দিলাম। ইচ্ছা, মারুফা মুখ খুলবার আগেই নায়েগ্রা সম্বন্ধে দু একটি চমৎকার তথ্য দিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দেয়া।

নায়েগ্রা নদীর তীরে বসবাসকারী উপজাতীয়দের মধ্যে একটি ছিলো Onguiaahra (অনগুইয়াহ্‌রা), ধারণা করা হয় সেখান থেকেই নায়েগ্রা নামটির উৎপত্তি। অনগুইয়াহ্‌রা শব্দটির অর্থ জলীয় বজ্র। নায়েগ্রা জলপ্রপাত প্রতি বছর প্রায় এক ফুট করে ক্ষয়ে চলেছে। চেষ্টা চলছে বিভিন্ন ধরণের পন্থা খাটিয়ে এই ক্ষয়কে প্রতি দশ বছরে এক ফুটে কমিয়ে আনতে। সেই তুলনায় আমেরিকান জলপ্রপাতটির ক্ষয় মাত্র তিন-চার ইঞ্চি প্রতি দশ বছরে। এর অর্থ কয়েক সহস্র বছর আগে এই জলপ্রপাতগুলির অবস্থান ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন জায়গায়। আমার ভান্ডারে আরো কিছু তথ্য ছিলো, কিন্তু মারুফার ক্রমাগত ব্যাঘাতে বাধ্য হয়ে থামতে হলো। বোঝা গেলো সেও ইতিমধ্যেই ইন্টারনেট সার্চে পটু হয়ে উঠেছে।

সীমা মুচকি হেসে বললো, "আমার কচি মাইয়াডার হাতে ভালোই জব্দ হইছেন। হের পাল্লায় তো পড়েন নাই। চব্বিশ ঘণ্টা বকবক কইরা আমারে জ্ঞানের সাগরে নাকানি চুবানি খাওয়াইতেছে।"

বিশাল হাসির রোল উঠলো। সেই শব্দ স্তিমিত হতে শিলির টিপ্পনি কানে এলো - "সবজান্তা ভালো জব্দ হয়েছে। সারাক্ষণ জ্ঞানের কথা শুনাচ্ছে।"

আমি রণে ভঙ্গ দিয়ে ক্ষুদে স্পাইডারম্যানদের পিছু নিলাম। মারুফাকে নিয়ে সমস্যা হবে মনে হচ্ছে। আমার জ্ঞানের তরী ভরাডুবি হবার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। উদ্বিগ্নতা অনুভব করছি।

চারদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে উভয় তীর থেকে জলপ্রপাত দুটির উপরে বাহারী আলো ফেলে বেশ একটা স্বপ্নময় পরিবেশ সৃষ্টি করা হলো। গ্রীষ্মে প্রতি শুক্রবারে শুনেছি ফায়ার ওয়ার্কস হয়ে থাকে। নিজে কখনো দেখিনি।

রাত প্রায় ন'টা পর্যন্ত কাটিয়েও যখন হারানো পথিকদের কোন হদিস মিললো না তখন আমরা পাততাড়ি গোটানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। গাড়িতে উঠতেই আমাদের মহাবীরেরা নেতিয়ে পড়লেন ঘুমের অতল কোলে। শান্তি! তাদের বকবকানির চোটে জীবনটা অতিষ্ট হচ্ছিলো ।

স্বভাবমতই ফিরতি পথে ডানে বায়ে করে QEW তে উঠবার পথটা সম্পূর্ণ গুলিয়ে কোন এক অজানা রাস্তায় গিয়ে হাজির হলাম। শিলির গঞ্জনায় কর্ণপাত না করে প্রচুর বুদ্ধিমত্তা ও সহিষ্ণুতার অপব্যবহার করে শেষ পর্যন্ত যখন হাইওয়েতে উঠলাম ততক্ষণে আধঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। মাসুম ভাই ও নোমান ভাইরা অনেক এগিয়ে গেছেন। বাসায় ঢুকতেই আনসারিং মেশিন বিপ বিপ ধ্বনিতে জানিয়ে দিলো মেসেজের উপস্থিতি। সীমা বৈ আর কেউ নয়। "শিলি আপা, ভাই কি আবার পথ হারাইলো? এই মানুষটার সমস্যা কি? বেশি কইরা হাড্ডি গুড্ডি খাওয়াইয়েন। মাথার মইধ্যে ক্যালসিয়ামের অভাব হইছে মনে হয়। আবার হাড্ডি খাইতে গিয়া দাঁত ভাইঙ্গা না ফালায়। মুসিবতের উপরে মুসিবত হইবো। কল দিয়েন --"

শিলি কলকলিয়ে হেসে উঠলো। আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লাম, দিন কাল ভালো যাচ্ছে না।

তৃণাদের বাসায় অনেক দিন যাওয়া হয়না। শিলির দূরসম্পর্কের আত্মীয় হন তৃণার বাবা হাসেম ভাই। কিন্তু তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার মূল কারণ আত্মীয়তা নয়। তার তিনটি মেয়েঃ তৃণা - দশ, পুষ্পা - ছয় এবং উর্মিলা - তিন। প্রথম দর্শনেই আমরা স্বামী-স্ত্রী এই মেয়ে তিনটির মোহে আটকে গেছি। আশা ছিল আমাদের প্রথম সন্তান একটি মায়াময়ী কন্যা হবে। যাকে পেয়েছি, তার মেজাজের বহরে জীবন অতিষ্ঠ। একটি খুব আনন্দদায়ক পরিবেশকেও এই ক্ষুদ্র শর্মাটি নিমেষে তিক্ততায় পূর্ণ করতে পারে। বড়ই ঝামেলা হয়।

হাসেম ভাই মালয়েশিয়ায় কুয়ালালামপুরের নিকটবর্তী একটি ইউনিভার্সিটিতে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কোনো একটি বিষয়ে পড়াতেন। টরোন্টোতে নিবাস গেড়েছেন বছর তিনেক হলো। বন্ধু বৎসল। এক গ্লাস পানি চাইলে মোগলাই খানা এনে হাজির করেন।

শিলির বাড়াবাড়ি পছন্দ নয়। হাসেম ভাইয়ের আতিথেয়তায় আতিশয্য হলেই সে ভ্রু কুঁচকে ফেলে। "হাসেম ভাই, সব কিছু এমন বেশি বেশি করবেন না। একদম ভালো লাগে না।"

হাসেম ভাই তাকে স্নেহ করেন। তিনি এই জাতীয় কথায় ঝকঝকে দাঁতের রাশি দেখিয়ে শিশুদের মতো খিলখিলিয়ে হেসে ওঠেন।

এই ধরনের ব্যবহারে শিলির বিরক্তির কাটা দ্রুত উর্ধে ধাবিত হয়। "হাসেন কেন? হাসির কথা তো কিছু বলিনি।"

হাসেম ভাইয়ের সুরেলা হাসিতে নতুন ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়।

মাস দুয়েক আগে পুষ্পার ষষ্ঠ জন্মদিনে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ দেয়া হলেও যেতে পারিনি। প্রজেক্টের কাজে মন্ট্রিঅল যেতে হয়েছিল। ফিরে এসে শুনেছি দিনটি খুব ধুমধামের সঙ্গেই পালিত হয়েছিল। তৃণার নাচে-গানে ভয়ানক আগ্রহ। জুলেখাভাবীও অত্যন্ত সংস্কৃতমনা। অতীতে কোনো এক সময় হয়তো শখের বশে কিছু নাচ-গান শিখেছিলেন। সাধ্যমতো শিখিয়েছেন বড় মেয়েটিকে। যদিও হিন্দি ছবির কল্যাণে এখানকার অল্প বয়স্ক মেয়েগুলোর নাচের নানান ভঙ্গি আয়ত্ত হয়ে যায়। তাদের পোশাক-আষাক ও চলনে-বলনে যে নাটকীয়তা নজরে পড়ে তাতে হাসি চাপা দায় হয়ে পড়ে।

তৃণার কয়েকটি সাগরেদ আছে। একই তলায় আরেকটি সিলেটি পরিবারের বাস। তাদের আট বছরের মেয়ে ডেইজি তৃণা আপু বলতে অজ্ঞান। সর্বক্ষণ নাকি এ বাসাতেই তার আস্তানা।

ছয় সাত বছরের নাজরা থাকে ঠিক উপরের তলায়। তারা পাকিস্তানের। বাবা-মা দুজনই কাজ করেন বলে নাজরাকে স্কুলের পরে তৃণার সঙ্গেই সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকতে হয়। জুলেখাভাবীর ভাষ্য অনুযায়ী এ বাসাতে সে এতো স্বাচ্ছন্দ বোধ করে যে প্রায়ই এখানেই রাত যাপন করে।

যাহোক ডেইজি, নাজরা, পুষ্পা ও উর্মিলাকে নিয়ে তৃণার নাট্যসংঘ। জানা গেল মুম্বাই-র যাবতীয় হিট সিনেমাগুলোর নাচে-গানে তাদের পারদর্শিতা অন্যের ঈর্ষা উদ্রেককারী হলেও সেটাই তাদের একমাত্র গুণ নয়, তারা অভিনয় শিল্পেও সমভাবে পারদর্শী। পুষ্পার জন্মদিনে অনুপস্থিত থাকায় তাদের শৈল্পিক কর্মকান্ড কিছুই দেখা হয়নি। আজকের এই আসা যেন তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে। ভিডিওতে শুধু যে দেড় ঘন্টার অনুষ্ঠানটি অনড় বসে থেকে দেখতে হলো তাই-ই-নয়, আমাদেরকে জানানো হলো, শুধু আমাদের সম্মানে এই প্রতিভাময়ীদের দলটি একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে। মনে মনে প্রমাদ

গুণলাম। মুখে অবশ্য অর্ধচন্দ্রের মতো কর্ণ-টু-কর্ণ হাসি ঝুলিয়ে রাখলাম। তৃণাদের প্রস্তুতি পর্ব চললো বেশ কিছুক্ষণ। বাক্স খুলে রঙবেরঙের ঘাগরা বের হলো। কে কোনটি পরবে তা নিয়ে কিঞ্চিৎ ঠেলাঠেলি, মনোমালিন্য এবং পরিশেষে উর্মিলার উদাত্ত ক্রন্দন। বেডরুমে দরজা বন্ধ করে রিহার্সাল চললো।

জুলেখা ভাবী এই অবসরে আরেকটি অপকর্ম করলেন। তিনি চুলায় পোলাও-কোর্মা বসিয়ে দিলেন। এমন কুবুদ্ধি কার মস্তিষ্ক থেকে আসতে পারে সে তো জানাই। কিন্তু হাসেম ভাইকে ঝাড়ি মারার সুযোগ হলো না। তার আগেই তিনি কেটে পড়লেন ডেইজি ও নাজরার বাবা-মায়েদেরকে আমন্ত্রণ জানানোর অজুহাত দিয়ে।

অধিকাংশ ছুটির দিনেই তাদের কারো না কারো কাজ থাকে। আজ গ্রহে নক্ষত্রে এমনই মিলেছে যে সকলেই বাসায়। ভেবেছিলাম ঝট করে এসে দেখা করে ফুটে যাবো। বস্তুত মেলা বসে গেল। খাওয়া দাওয়া, নাচ-গান, কিছু সুখ -দুঃখের গল্প। মন্দ নয়। যদিও গ্রীষ্মে মাঠে ঘাটে না কাটাতে পারলে শরীর নিষপিষ করে, মনে হয় দিনটা আঠারো আনাই মিছা। কিন্তু এই মায়াময়ী মেয়েগুলো শখ করে কিছু একটা করছে। কোন মুখে যাই!

জাকিকেও দেখলাম খুব উৎসাহের সঙ্গে তৃণার পিছু পিছু ছুটছে। পুষ্পা ওকেও একটি ঘাগরা পরানোর চেষ্টা করতে গিয়ে অবশ্য প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়ে পিছিয়ে গেছে। বেডরুম থেকে হিন্দি গানের বাজনা আর বাচ্চাগুলোর কলকাকলি শুনে বুঝলাম তাদের অন্তত সময়টা ভালো কাটছে।

হাসেম ভাইয়ের সঙ্গেই ডেইজির বাবা-মা চলে এলেন। ভদ্রলোকের নাম মহব্বত আলী। তার স্ত্রীর নাম ডালিয়া। উভয়েই অত্যন্ত হাসি-খুশি স্বভাবের। মহব্বত ভাই ফুর্তিবাজ মানুষ। আলাপের শুরুতেই একটি কৌতুক করে হো হো করে হাসতে লাগলেন। হাসেম ভাইকেও গলা মেলাতে দেখে আমিও বোকার মতো হাসতে গিয়ে দুটি ঢেকুরের মতো শব্দ করলাম। মহব্বতভাইয়ের কথাবার্তা সবই খাস সিলেটি ভাষায়। দুই চারটি শব্দের বাইরে কিছুই বুঝতে পারছি না।

নাজরার বাবা মোহাম্মদ নিয়াজ ও মা নাজমা শিগগিরই এসে হাজির হলেন। নিয়াজ ভাই মধ্যবয়সী, কিঞ্চিৎ ঠান্ডা স্বভাবের।

নাজমা আজানুলম্বিত বোরখা পরে এসেছেন। চোখের স্থানে নামকাওয়াস্তে ফাঁকা। তিনি দ্রুত পায়ে হেটে রন্ধনশালায় নারী মহলে চলে গেলেন। এমন গরমের দিনে এই পোশাকের নিচে বেচারীর করুণ অবস্থা বিবেচনা করে ক্ষণিকের জন্য চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েছিলাম। মহব্বত ভাইয়ের সতেজ হাসির আওয়াজে বাস্তবে ফিরে এলাম।

নিয়াজ ভাইকেও খুশি মনে হাসতে দেখে জিজ্ঞাসু নয়নে তাকাতেই তিনি চিবিয়ে চিবিয়ে উর্দুতে বললেন, "ভায়া, কিছু না বুঝলেও হাসতে তো মানা নেই, ভাইসাহেব খুশি হন।"

মহব্বত ভাই সেই মন্তব্যে কিঞ্চিৎ মনঃক্ষুণ্ন হয়ে তার কৌতুকগুলো ইংরেজিতে অনুবাদ করে বলার চেষ্টা করতে লাগলেন। তার ইংরেজিতে বুৎপত্তি ন্যূনতম। শিগগিরই কৌতুকে ক্ষান্ত দিয়ে দৈনন্দিন জীবনের আলাপে মগ্ন হয়ে গেলাম আমরা।

হাসেম ভাইয়ের কল্যাণে মহব্বত ভাইয়ের সঙ্গে আলাপচারিতা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হলো। ভদ্রলোক দেশে বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। এখানে এসে একটি খাবারের দোকান খুলে বসেছেন। মোটামুটি চলছে। কিন্তু খাটুনি খুবই বেশি। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই প্রায় সর্বক্ষণ সেখানেই পড়ে থাকেন। মাঝে মধ্যে দুটি অল্প বয়স্ক ছেলেমেয়ে তাদের পরিবর্তে কাজ করে। আজ তেমন একটি দিন।

নিয়াজভাই বড় একটি ওষুধ কম্পানির হোমড়া-চোমড়া গোছের কেউ ছিলেন। এখানে আসা পর্যন্ত গার্ডের কাজ করেন ডাউনটাউনের একটি বিল্ডিংয়ে। কাজটি নিতান্ত মন্দ নয়। কিন্তু দীর্ঘ দিন এই কাজ করতে তার আগ্রহ নেই। তিনি কোয়ালিটি কন্ট্রোল-এর ওপর একটি কোর্স করছেন। আশা আছে ভালো কিছু একটা হয়ে যাবে।

আমাদের আলাপে বিঘ্ন ঘটিয়ে সহাস্য মুখে তৃণা ঘোষণা দিল, "আজকের শিল্পানুষ্ঠান এখনই শুরু হতে যাচ্ছে। সুধীমন্ডলী, অনুগ্রহ পূর্বক করতালি দিয়ে আমাদের শিল্পীদেরকে অভিনন্দন জানান।"

প্রবল করতালি ম্রিয়মাণ হওয়ার আগেই ঘাগরায় ঢেউ তুলে আর ঘুঙুরে ছন্দ জড়িয়ে শুরু হলো নৃত্য। জাকি ও উর্মিলা সেই নৃত্যে যোগ দেয়ায় সব কিছু ভন্ডুল হয়ে যাবার উপক্রম হলো। শেষ পর্যন্ত আমাদের হস্তক্ষেপে আনাড়ি দুজনকে আপাতত সরিয়ে আনা সম্ভব হলেও তাদের তীক্ষ্ণ প্রতিবাদী চিৎকারে গান চাপা পড়ে গেল।

জনতার এমন অযাচিত ব্যবহারে মনঃক্ষুণ্ন হয়ে অনুষ্ঠান কাটছাট করে একটি ট্যালেন্ট শো সংযোজন করলো তৃণা। উর্মিলা মঞ্চে উঠে 'ধিন-তাকা-ধিন-তাকা' করে দুই পাক টলমল পায়ে চক্কর দিয়ে সকলের হৃদয় জয় করে নিল।

জাকির পালা আসতে সে স্বভাবসিদ্ধভাবে একটি অভাবনীয় নাটকীয়তার সূচনা করলো। সে এখন আর নৃত্যে আগ্রহী নয়। তার এখন ছবি আঁকতে ইচ্ছা হচ্ছে। কাগজ ও রঙ পেন্সিল চলে আসতে সে অভিজ্ঞ চিত্রকরের মতো আঁকিবুকি আঁকতে শুরু করলো। স্পাইডারম্যান আঁকা দিয়ে তার অংকনে হাতেখড়ি হয়েছিল। সেই থেকে নিজ প্রচেষ্টাতেই তার দক্ষতা যথেষ্ট বেড়েছে বলেই আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়। আমাদের অ্যাপার্টমেন্টটির অভ্যন্তরে দেয়ালে দেয়ালে নানান জাতীয় সুপার হিরোদের নানান ভঙ্গির বিচিত্র বর্ণের সব চিত্র যে হারে শোভা পাচ্ছে তাতে পিতা-মাতার হৃদয়ে শংকার সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। চিত্রশিল্পী ও গাজার কলকে এই বস্তু দুটির ঘনিষ্ঠতা অপরিহার্য বলেই মনে হয়।

পুষ্পা স্নেহমাখা কণ্ঠে বললো, "ও বোধ হয় বড় হয়ে আর্টিষ্ট হবে।"

উদ্বেগ অনুভব করি। রক্ষা করো বিধাতা!

খাওয়ার ডাক পড়লো। এই পর্বটি আমার সবচেয়ে প্রিয়। ইদানিং অবশ্য শিলির কটুক্তি যথেষ্ট বিরক্তির উদ্রেক করছে। আমার উদর এলাকার চুল পরিমাণ স্ফীতিও তার নজর এড়ায় না।

ভোজনের পালা চুকতে তিন কন্যা আমাকে চেপে ধরলো কোনো একটি তেলেসমাতি কান্ড করার জন্য। এবার আমার ত্রাহি ত্রাহি চিৎকার করার পালা। সমগ্র জীবন যে অন্যের ট্যালেন্ট দেখে দেখেই কেটে গেল সে কথা এই মেয়েগুলোকে কি করে বোঝাই? বাল্যকালে ক্যাডেট কলেজে পড়ার সুবাদে এক সোনাঝরা দিনে রাজ্যের মানুষের সামনে মঞ্চে উঠেছিলাম কবিতা আবৃত্তি করতে। কবিতার নাম, Mary's little lamb. কিন্তু বিধির কি বিধান। সমগ্র সপ্তাহ ধরে কণ্ঠস্থ করার পরও শত আঁখির সম্মুখে দাঁড়িয়ে এমনই ভড়কে গেলাম যে প্রথম দুটি লাইন কোনোক্রমে বলে সেই যে প্রস্তরীভূত হয়ে গেলাম মঞ্চের পেছন থেকে জনৈক বড়ভাইয়ের শত হইচইয়েও কোনো বিকার হলো না। এ লজ্জা রাখি কোথায়? তৃণার শত অনুরোধেও অনড় রইলাম। শিশুরা যেমন সহজে মানুষকে ইজ্জত দেয় তেমনি বেইজ্জতির ব্যাপারগুলো দীর্ঘ দিন মনে রাখে। এই বয়সে নতুন কোনো ঝুঁকি নিতে রাজি নই। হাসেম ভাইকে সঞ্চয়িতা হাতে ধরিয়ে দিতে তিনি একটির পর একটি কবিতা আবৃত্তি করে আমাকে এই যাত্রা রক্ষা করলেন।

জুলেখা ভাবী আজকের দিনটিকে আরো আনন্দময় করে তোলার জন্য নিজেই একটি বড়সড় কেক বানালেন। দুর্ভাগ্যবশত ওভেনের কোনো ত্রুটির কারণে বস্তুটি বিশেষ সুবিধাজনক হলো না।

পুষ্পার হাস্যময় মুখখানি মলিন হয়ে উঠলো। সে ব্যথাতুর কণ্ঠে বললো, "দোকানে কতো সুন্দর সুন্দর কেক পাওয়া যায়। আমরা কানাডা এসে গরিব হয়ে গেছি।"

তার কথাগুলো যেন বোমের মতো পড়লো। আমি ও শিলি উভয়েই ভয়ানক অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। জন্ম পর্যন্ত দেখে আসছি গরিব গ্রাম-গঞ্জে, শহরে। সেটা আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মন খারাপ করার মতো কোনো বিষয় নয়। কিন্তু একটি প্রিয় বালিকার মুখে যখন দারিদ্রের কথা আসে তখন সমগ্র হৃদয় আনচান করে ওঠে।

আমি একটা কেক নিয়ে আসার প্রস্তাব দিতে হাসেম ভাই ও ভাবী উভয়েই ভয়াবহ আপত্তি তুললেন। জানা গেল, পুষ্পার প্রকৃত জন্মদিনে সত্তর ডলার দিয়ে বিশাল কেক নিয়ে আসা হয়েছিল। আজ জুলেখা ভাবীই বানিয়েছেন কারণ তার কেক বেশ মজা হয়। কোনো কারণে আজই গড়বড় হয়ে গেল। মেয়েকে নীরব দৃষ্টিতে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন ভাবী।

মেয়ে তাকালো বাবার দিকে সমর্থনের আশায়।

হাসেম ভাইয়ের মেয়ে - অন্ত প্রাণ। তিনি তরল কণ্ঠে বললেন, "ও তো মিছা কিছু কয় নাই। মালয়েশিয়ায় আমাগো কতো বড় বাংলো বাড়ি আছিল, গাড়ি আছিল, ড্রাইভার আছিল, যেখানে মন চাইতো যাইতাম গিয়া। আর অহন একটা গাড়িও নাই। মাইয়াগুলা কোথাও বেড়াইতে যাইতেও পারে না। কি কও পুষ্পা, ঠিক কইছি?"

পুষ্পা ফ্যাকাসে মুখে হ্যাঁ সূচক ভঙ্গি করলো। তৃণা যোগ করলো, "মালয়েশিয়ায় আব্বুও কতো টাকা পেতেন। আমরা কতো কি করতে পারতাম।"

স্বাভাবিকভাবেই জানতে চাইলাম, "এলেন কেন?"

হাসেম ভাই হেঃ হেঃ করে অর্থহীনভাবে হাসলেন।

"আইলাম পোলাপাইনের ল্যাহাপড়ার কথা ভাইবা। যেহানে ছিলাম ভালা ইংলিশ স্কুল আছিল না। হেরা মালয় ভাষায় পড়তো। অগো জন্যেই তো সব, ঠিক না? ঠিক না? তয় আবার যামু গিয়া ভাবতাছি। কাম হয়তো অহনও অইতে পারে। কি আম্মারা, তোমরা যাইবা?"

সম্মিলিত কণ্ঠের প্রত্যুত্তর এলো, "না-আ-আ।"

বিস্মিত কণ্ঠে বললাম, "কেন?"

তৃণা ও পুষ্পার সম্মিলিত জবাব, "এখানে স্কুল ভালো।"

শুনে ভালো লাগলো যে, এই সাময়িক অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যেও মেয়েগুলো একটি আনন্দময় দিক খুঁজে পেয়েছে। পাবলিক স্কুলে লেখাপড়া সম্পূর্ণ ফ্রি। উপরন্তু বাবা মায়ের উপার্জনের ওপর নির্ভর করে সরকার সন্তানদের জন্য মাসিক ভাতা দিয়ে থাকে। সেটি খুব বেশি নয়। তবুও কিয়ৎ পরিমাণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দিতে পারে।

নিয়াজ ভাই বললেন, "আমাদের সকলেরই এক অবস্থা। আমার মেয়েটাও ঘন ঘন অভিযোগ করে। কিন্তু সব ভালো যার শেষ ভালো তার। আল্লাহর ইচ্ছায় মেয়েটির লেখাপড়া ভালো হবে। সে অনেক বড় হতে পারবে।"

সব ছেড়েছুড়ে দেশান্তরি হওয়ার ভালো-মন্দ দুটি দিক নিয়েই আলাপে নিমজ্জিত হয়ে পড়ি আমরা।

ছেলেমেয়েরা খেলায় মেতে ওঠে।

মহব্বত ভাই দুর্বোধ্য কৌতুক চালিয়ে যেতে থাকেন।

দ্বিতীয় দফা চায়ের প্রস্তাব উঠতেই অবশ্য আসর ভেঙে গেল।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হওয়ার উপক্রম। মহব্বত ভাইকে দোকানে যেতে হবে। নিয়াজভাইকে যেতে হবে কাজে। আজ তার রাতে ডিউটি। স্পষ্টতই এই কাজে তার মনোযোগ নেই, আগ্রহও নেই। কিন্তু অন্যান্য অনেক কাজের চেয়ে শান্তি ময় এবং মেডিকাল ইনশিওরেন্স আছে বলে তিনি লেগে আছেন। এ দেশে সরকার চিকিৎসা ফ্রি রাখলেও সব কিছুর খরচ বহন করে না। ওষুধ, দাঁত, চোখের জন্য পৃথক ইনশিওরেন্স কিনতে হয়। অল্প মানুষই কেনে।

নিয়াজ ভাই বিদায় নেয়ার আগে ম্লান হেসে বললেন, "দেশেও সমস্যা ছিল। নানান ধরনের অপ্রীতিকর কাজ করতে হতো। আর্থিক সমস্যাটা ছিল না। এটুকুই ভালো ছিল।"

নাজমা বোরখার অভ্যন্তর থেকে ধিক্কার দিলেন, "কতো করে বলেছিলাম যেও না। এবার? সুখে থাকলে ভূতে কিলায়।"

এ কথায় হাসেম ভাই খুব হাসতে লাগলেন। " ঠিক বলেছেন ভাবী। বহুৎ ঠিক বলেছেন। এয়সা বাত কিয়া তোম! হাঃ হাঃ হাঃ। সুখে থাকলে ভূতে কিলায়। "

নিয়াজ ভাই শ্রাগ করে বললেন, "ছিলেম খচ্চর, হলেম গর্দভ! "

সকলে বিদায় নিতে এবার আমাদের যাবার পালা এলো। তৃণা, পুষ্পা ও উর্মিলাকে আদর করে, শিগগিরই তাদেরকে আমাদের বাসায় বেড়াতে নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিলাম। মনটা কিঞ্চিত ভারাক্রান্ত। তবুও এই ভেবে ভালো লাগলো একদিন এই মেয়েগুলি অনেক বড় হবে এবং তখন এই দিনগুলির কথা ভেবে সাফল্যের সত্যিকারের আনন্দটুকু উপভোগ করতে পারবে।

উইক এন্ড এলেই নিদেনপক্ষে একটা পারিবারিক সমাবেশ প্রায় সবারই থাকে। জন্মদিন, বিবাহ বার্ষিকী, মিলাদ জাতীয় ব্যাপারতো লেগেই আছে। যখন সেসব কিছু থাকে না তখন কিছু বন্ধু পরিবার হয়তো মিলিত হয়ে একটা সন্ধ্যা হৈ-হট্টগোল করে কাটিয়ে দেয়। এই শেষোক্ত ব্যাপারটি আমার পছন্দ। সপ্তাহের পাঁচদিন প্রানান্ত ঘানি টেনে অন্ততপক্ষে একটা দিন যদি পরনিন্দা, পরচর্চা করার সুযোগ না পাই, তাহলে আমার পুরো সাতদিনই বৃথা যায়। দ্বিতীয় একটি কারণও আছে। জাকি একমাত্র সন্তান হওয়ায় গৃহে আমাকে এবং শিলিকেই তার জিকরে দোস্ত থেকে শুরু করে মুরব্বীর ভূমিকা পালন করতে হয়। এখানে আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনেরা সকলেই বেশ দূরে বসবাস করেন। ফলে বেচারীর মামা-চাচা বলতে এই দেশে 'দুধের সাধ ঘোলে মেটানোর' মতও কেউ নেই। 'মন্দের ভালো হোক' আর 'সমগ্রই মন্দ' হোক, এই দিশেহারা পিতৃব্যক্তিটিকেই 'একই অঙ্গে অনেক রূপ' ধারণ করে কখনো বাবা, কখনো মামা আবার কখনো কাকা-চাচার ভূমিকা পালন করতে হয়। সপ্তাহে যে ক'টা দিন স্কুল খোলা থাকে ছেলেমেয়েরা সাধারণত বেশ ব্যস্ততার মধ্যে থাকে। বাবা-মায়েদের কাজ, ছেলেমেয়েদের স্কুল-তখন সামাজিকতা করবার অবসর থাকেই না বলা যায়। ছুটির দিন এলেই আমি গণজমায়েতের জন্য উঠে পড়ে লেগে যাই। অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে হলেও বহুরূপীর ভূমিকা থেকে নিস্তার পাওয়া যায়। ক্ষুদে মানবেরা ক্ষুদে মানবদের সঙ্গ পায়, দগ্ধ মানবেরা দগ্ধদের।

এই বিশেষ সন্ধ্যায় আমরা চলেছি জহীর ভাই ও সুফিয়া ভাবীর বাসায়। তাদের ভাষ্য অনুযায়ী এই সমাবেশ 'এইতো এমনিই', কিন্তু গোপন সূত্রে শিলি জেনেছে আজ তাদের পঁচিশতম বিবাহবার্ষিকী। ফলে গিফ্‌ট কিনতে হয়েছে। পকেটে হাত গেলেই সর্বশরীরে ঝংকার ওঠে। অনেকে এই বিশেষ প্রতিক্রিয়াকে কিঞ্চিৎ অপমানজনক একটি শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করে থাকেন। কিন্তু প্রতিটি পয়সাও যখন অর্জিত হয় সততায় এবং শ্রমে, তখন মমতার বাহুল্য থাকা অবাঞ্চিত নয়।

জহীর ভাইয়ের বাসায় পৌঁছে দেখি এলাহি কান্ড। তাদের এটাচ্‌ড টাউন হাউস। পার্কিং স্পট অল্পই। বাসার সামনে রাস্তায় গাড়ীর সারি পড়ে গেছে। পার্কিং পাওয়া গেলো না। ডাবল পার্কিং করলাম। ভেতরে ঢুকে জহীর ভাইকে বলে রাখলেই হবে।

সদর দরজা ঠেলে ভেতরে পা রাখতেই সুফিয়া ভাবী হাসি মুখে স্বাগত জানালেন। লিভিংরমে ঢুকতেই শিশুদের দলটি ছুটে এলো। জনি, শাফিন, রাফিন, ইতি, বীথিসহ আরোও কয়েকটি অচেনা মুখ। জাকি তাদেরকে দেখেই আলোকিত হয়ে উঠলো। শিলি পুত্রকে ইদানিং সামাজিকভাবে উন্নত করে তুলবার চেষ্টা করছে। তার বহুবিধ অনুরোধেও পুত্রধরের সর্বদা খই ফোটা মুখেও সালাম জাতীয় কোন শব্দ এলো না। পিতা-মাতাদের ভিড় থেকে বেশ কয়েকটা কণ্ঠস্বরের করণ মিনতি ভেসে এলো

- "সালাম দাও আঙ্কেল-আন্টিকে, মানিক।"

- "কি হলো? কি শিখিয়েছি তোমাদেরকে?"

-"হাই (Hi) বলো ।"

ইত্যাদি ।

মুহূর্তের মধ্যে তাদের কলকাকলি থেমে গেলো । ক্ষনিক পূর্বের উজ্জ্বল মুখগুলিতে বেদনার বিরস ছাপ । দু'একটি কণ্ঠ বিড় বিড়িয়ে কিছু বললো, বোঝা গেলো না ।

জনির মা সীমা খনা গলায় বললো, - "যা ভাগ সব বিচ্ছুর দল । একটা সালাম দিতে কইলে গলার মধ্যে বেজি ঢুকে । একডু গলাডা খুইলা সালাম দেওন যায় না? সালেমালেকুম! মনে হয় য্যান ঘুমাইয়া যাইতাছে ।"

হাসির রোল ওঠে । বিচ্ছুর দল প্রথম সুযোগেই উধাও হয় । শিলি সীমার সাথে জোট পাকায় । ভাবীদের অনেকেই এসেছেন । আমি জনাবদের দলে ভিড়ে যাই । মাসুম ভাই, বিলাল ভাই, আলতাফ ভাই সহ আরোও অনেকেই এসেছেন । একটি ব্যাপার লক্ষ্য করে বেশ ভালো লাগলো । অনেকেই তাদের বয়েসী ছেলেমেয়েদেরকে সাথে নিয়ে এসেছেন । আমি ব্যক্তিগতভাবে দ্বাদশ বর্ষে উপনীত হবার পর বাবা-মায়ের সাথে দাওয়াতে যাওয়াটা অসম্মানজনক মনে করতাম । এই তরুণ-তরুণীরা যে এই ধরণের সমাবেশে হাজির হয়েছে তা দেখে চিত্ত পুলকিত হওয়াটা স্বাভাবিক ।

জহীর ভাইয়ের দুটি ছেলে । বড়টি অমল, ছোট অতল । দুজনই কমার্স থেকে অনার্স শেষ করে বাবার সাথে কোমর বেঁধে ইমপোর্ট এক্সপোর্টের ব্যবসায় নেমে পড়েছে । ভদ্র, অমায়িক ছেলে দুটি । পরিণত বয়স্ক ছেলেমেয়েরা হাসি মুখে সামান্য একটি সম্বোধন করলেও জীবন ধন্য মনে হয় । তাদের সাথে রীতিমতো আলাপচারিতা চলে । শীঘ্রই উপস্থিত তরুণ-তরুণীদের সকলের সাথেই পরিচিত হবার সৌভাগ্য হয় । মঞ্জুর ভাই এবং আমিনা ভাবী দুজনই কৃষি-বিজ্ঞানে পেশাজীবী ছিলেন । কপালের লিখন, এ দেশে এসে বিল্ডিং ম্যানেজার হয়েছেন । কাজটি সম্মানজনক,তবে পেশাগত অভিজ্ঞতার অসামঞ্জস্য দুর্বল হৃদয়কে পীড়া দিতে পারে । তাদের মেয়ে ডেইজি স্থানীয় ইউনিভার্সিটি অব টরোন্টোতে জার্নালিজম পড়ছে । ছেলে রিয়াদ পড়ছে ইউনিভার্সিটি অব অটোয়াতে । চার ঘণ্টার দূরত্ব, হোস্টেলে থাকে । মাঝে মাঝে দয়া পরবশ হয়ে জনক জননীকে দর্শন দিয়ে যায় ।

জায়েদ ভাই একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ম্যানেজার । পূর্ব জীবনে খুব সম্ভবত পুলিশ অফিসার ছিলেন । তিনি পরিষ্কার করে কিছু বলেন না । মা সততার স্কন্ধে আরোহন করে তার হৃদয় সরোবরে যে শান্তি-সুখের হিল্লোল উঠেছে তাতে সন্দেহ নেই । নীনা ভাবী অবশ্য গৃহকর্মে সহযোগী অর্ধ ডজন কাজের লোকদের অভাব তীব্রভাবে অনুভব করেন এবং আজ এতো বছর পরেও তিনি অভিযোগ করেন । তাদের দুটি ছেলে বশীর ও ইমন । বশীর ফিজিক্সের একটি এডভ্যান্স সাবজেক্টে পিএইচডি করছে । ইমন গ্রাজুয়েশন শেষ করে একটি সীমিত সময়ের চাকরি নিয়ে ইন্দোনেশিয়া গিয়েছিলো । অল্প কিছুদিন হলো সে ফিরে এসেছে । ইতিমধ্যে একাধিক স্থায়ী চাকরির অফার এসেছে । এই দেশের বিদ্যাপীঠে জ্ঞানার্জন করে কর্মহীন থাকার সম্ভাবনা নিতান্তই কম । বিশেষত যাদের বিদ্যায় মনোযোগ আছে এবং ভবিষ্যতের সাফল্যে আগ্রহ আছে তাদের কোন প্রতিবন্ধকতা আছে বলে মনে হয় না ।

তবে সকলেই যে সমানভাবে সাফল্যে আগ্রহী হবে এমন ভাবার কোন কারণ নেই । কোন কোন তরুণ মনে এমন প্রশ্ন জাগা অস্বাভাবিক নয় - সাফল্য কি? সাফল্যের মাপকাঠি কোনটি? বছরের পর বছর বিদ্যার্জনের এই প্রচেষ্টার অর্থ কি? শিহাব মামা ও বেলা মামীর বড় ছেলে আসিফ, কানে দুল ঝুলিয়ে আর চিবুকে চিকন কাট দাঁড়ি রেখে সে এমন একটি ভঙ্গি

করছে যে তাকে কল্পনার কৃষ্ণ ডাকাতের মতো লাগছে; এই বুঝি রে-রে করতে করতে তেড়ে এসে টুটি চেপে ধরে। আজকাল চারদিকে গ্যাংএর বড় উপদ্রব শুরু হয়েছে। আসিফও সেই দলে নাম লিখিয়েছে কিনা কে জানে। বিদ্যার্জনে তার অনাগ্রহ সর্ববিদিত। সে একটি ম্যাকডোনাল্ডস রেস্টুরেন্টে ক্যাশিয়ারের কাজ করে। এই মুখ দর্শনের পর ভোজনের তাগিদ বজায় থাকতে পারে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। সে আমার দিকে তাকিয়ে কঠিন দৃষ্টি হানলো।

খুব শীঘ্রই আমাদের পুরষ মহলে স্থানীয় রাজনীতি নিয়ে আলাপের ঝড় উঠে যায়। আমার জ্ঞান সীমিত, কিন্তু আলাপে অংশগ্রহণ করার তাগিদ অদম্য। স্বভাবজাত ভঙ্গিতে কণ্ঠস্বর চড়িয়ে, দু'একটি তথ্যের উপর ভরসা করে তর্কের তরী ভাসিয়ে দেই। নিকটেই সুপ্রশস্ত ডাইনিং টেবিলের উপর সুফিয়া ভাবী সাজিয়ে রাখছেন নানান স্বাদের, নানান জাতের খাদ্য সম্ভার। জিহ্বার নীচে জলীয় উপস্থিতি বিপদজনকহারে বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্থহীন তর্কে বিরতি দিতে হয়। অপেক্ষা করে থাকি কখন খাবারের আহ্বান আসবে। মৌ মৌ গন্ধে পেটে দামামা বাজছে।

আহ্বান এলো, তবে খাবারের নয়, 'হাইড এণ্ড সিক' (hide and seek) খেলার।

অতীতে, কোন এক কুক্ষণে এক দুর্বল মুহূর্তে আমাদের ক্ষুদে বাহিনীর সাথে লুকোচুরি খেলতে সম্মত হয়েছিলাম। এই মতিভ্রমের যথাযথ কারণ আজ মনে পড়ে না। কিন্তু পরিনতি যে সন্তোষজনক নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এখন প্রতিটি পারিবারিক সমাবেশেই ক্ষুদেবাহিনী আমার সন্ধান করে। আমি তাদের বিশ্বস্ত 'সিকার' (seeker)। তারা হাইড করবেন আমি সিক করবো। সহজ হিসাব। কিন্তু ঘন ঘন দাওয়াতের কল্যাণে উদর এলাকার যে উত্থান শুরু হয়েছে তাকে সামাল দিয়ে এই চঞ্চলমনা ছেলে মেয়েগুলির পিছু ধাওয়া করে বেড়ানো কিঞ্চিৎ কষ্টদায়ক হয়ে উঠছে। তবুও তাদের অনুরোধ ফেলতে পারি না। এমন মায়াময় কচি মুখগুলোর মমতাভরা অনুরোধ কিভাবে ফেলি? জহীর ভাইদের বাসাটি তিনতলা টাউন হাউস। পাঁচমিনিটে চারবার চক্কর দেবার পর গলদঘর্ম হয়ে ইস্তফা দিলাম। অনেক অনুরোধ উপরোধেও টলানো গেলো না আমাকে। মারুফা তিক্ত কণ্ঠে মন্তব্য করলো – "আংকেল বুড়া হয়ে গেছে। দেখছো না চুল পেকে যাচ্ছে।"

আঁতে লাগলো। দুদিকের জুলফিতে কয়েক ডজন আর ছড়িয়ে ছিটিয়ে মাথাময় আরও কিছু, তাতে বার্ধক্যের প্রশ্ন কোথা থেকে আসছে।

বাচ্চারা বিদায় হতে আড়চোখে ডাইনিং টেবিলটা পরখ করি। খাদ্য সম্ভারে তার প্রান্তর পূর্ণ। ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙতে শুরু করে। খোলো খোলো দ্বার, রেখো না আর, দুয়ারে আমায় দাঁড়ায়ে। দুয়ারের পাটাতন যে আচমকা সটান বন্ধ হয়ে যাবে তা কে জানতো। হঠাৎ মেয়ে মহলে হৈ চৈ পড়ে গেলো। লজ্জার মাথা খেয়ে সেই ভিড়ে নাক গলাতে রহস্য উন্মোচিত হলো। সুফিয়া ভাবী মূর্ছা গেছেন। তার ডায়াবেটিস আছে। এতোগুলি অভ্যাগতদের জন্য আয়োজন করতে গিয়ে প্রচুর পরিশ্রম করেছেন, নিজের প্রতি মনোযোগ দিতে কৃপণতা করেছিলেন। ফলাফল সংজ্ঞাহীনতা। পানির ঝাপটাতেও যখন সংজ্ঞা ফিরলো না তখন ৯১১ এ কল করা হলো। প্রায় লহমার মধ্যে এম্বুলেন্স চলে এলো। এম্বুলেন্সের লাল নীল বাতির ঝলকে নাকি বাইরের ঠান্ডা বাতাসে বোঝা গেলো না, কিন্তু এম্বুলেন্সে তোলার আগেই সুফিয়া ভাবীর সংজ্ঞা ফিরলো। তিনি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে সবাক কণ্ঠে বলতে লাগলেন, - "কি হয়েছে? সবাই কি দেখো তোমরা?"

এম্বুলেন্স বিদায় হতেই তিনি আবার মূর্ছা গেলেন। এবারে পানির ঝাপটায় চোখ খুললেও বিছানা ছাড়বার শক্তি পেলেন না। এই হৈ হট্টগোলে খাদ্য সম্ভার শীতল বরফে পরিণত হলো। আমার মতো ক্ষুধার্ত নিশ্চয় আরোও অনেকেই ছিলেন, কিন্তু এই বিব্রতকর পরিবেশে খাদ্যের প্রসঙ্গ তুলতে আমারই যখন সংকোচ তখন তাদের দোষারোপ করবো কি? সুযোগ বুঝে সকলের চক্ষু বাঁচিয়ে দু'টি মুরগীর রোষ্ট হাতিয়ে নিলাম। পেছনের আঙ্গিনায় গিয়ে ঝটপট সাবাড় করতে হলো।

বিলম্ব হলেও শেষ পর্যন্ত খাওয়া হলো। সুফিয়া ভাবী টলমল পায়ে হাটতে হাটতে সবার কাছে এই বিঘ্নের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন। জহীর ভাই তার পেছনে স্বল্প দূরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ করে চলেছেন, আবার কখন কি হয়ে যায়।

প্রায় দেড়টার দিকে আসর ভাঙলো। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, অধিকাংশ বাচ্চাই দেড়টা পর্যন্ত চুটিয়ে খেলেছে। গাড়িতে উঠবার পরেই তারা আচমকা নিদ্রাপুরীতে পাড়ি দেয়। আজও তার ব্যতিক্রম হলো না।

রাতের নীরবতা ভেদ করে আমরা বাসায় ফিরে যেতে থাকি ।

বহুদিন ধরেই শখ ছিলো কয়েকটা দিন নির্মল প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত কোন একটি কটেজে কাটাবো। নানান কারণে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছিলো না। পরিশেষে সমস্ত বাধা-বিপত্তি পায়ে ঠেলে খুঁজে পেতে 'থাউজ্যাণ্ড আইল্যান্ডস রিজিয়ন' (1000 Islands Region) এ একটি চার বেডরুমের কটেজ পাওয়া গেলো।

উত্তর আমেরিকাতে গ্রীষ্ম আসে ভয়ানক আনন্দ ও উত্তেজনা নিয়ে। ভয়াবহ শীতের পর গরমের আমেজ যেন সবাইকে পাগল করে দেয়। সেই পাগলামির নমুনা পেলাম কটেজ খুঁজতে গিয়ে। হাজার হাজার কটেজে কানাডার পূর্বাঞ্চল পরিপূর্ণ, কিন্তু কোনটাই ফাঁকা নেই। জানলাম আগ্রহী মানুষেরা ছয় মাস থেকে এক বছর আগেও নাকি সেগুলি ভাড়া করে রাখে গ্রীষ্মের দুই-এক সপ্তাহের জন্য। কারণটা বোঝা বিশেষ কঠিন নয়। গরমের সময়েই স্কুল দুই মাস বন্ধ থাকে। ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেড়াতে যাবার এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর হয় না। অবশ্য আবহাওয়ারও কিছুটা ভুমিকা আছে। শরতে হঠাৎ করেই এমন ঠাণ্ডা বাতাস শুরু হয়ে যায় যে বাইরে বেড়ানোর আগ্রহ অনেকেই হারিয়ে ফেলে।

চার বেডরুমের কটেজটি তিন দিনের জন্য ফাঁকা পেয়ে আমি মনে মনে যারপরনাই সন্তুষ্টি অনুভব করলাম। তবে এতো বড় একটি কটেজে একাকী বেড়াতে যাবার আনন্দ সামান্যই। আমি বেশ কয়েকজন আগ্রহী বন্ধু পরিবারের সাথে আলাপ করলাম। পূর্বে বিভিন্ন আলাপে তারা তাদের গভীর আগ্রহ প্রদর্শন করেছিল। দূর্ভাগ্যবশতঃ দুই মাস পরে কার কি পরিস্থিতি থাকবে তা নিয়ে তাদের সবাইকেই অল্প-বিস্তর চিন্তিত মনে হলো। তাদের কারোরই ধারণা ছিলো না কটেজ ভাড়া করবার ব্যাপারটা মাস দু'য়েক আগেই সারতে হবে। বাধ্য হয়ে আমি কটেজটি ছেড়ে দিলাম। মনটা বেশ খারাপ হলো। বন্ধুদের প্রতি যথেষ্ট নাখোশ হলাম।

সপ্তাহ খানেক পরে খানিকটা ঘটনাক্রমেই সালেহ, আমার নিউইয়র্ক নিবাসী বন্ধু, আমার কাছে কটেজে যাবার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করলো। প্রায় একই সময়ে আমাদের খুবই ঘনিষ্ঠ একটি তরুণ পরিবারও সঙ্গী হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলো। ছেলেটির নাম সুজন, মেয়েটি সুনয়না। প্রেম করে বছর দুয়েক হলো তারা বিয়ে করেছে। সুজন কানাডা আসার পর সুনয়নাও চলে এসেছে। সুজন মাটির মানুষ, সুনয়না কিঞ্চিৎ খামখেয়ালি। তারা দু'জনাই আমার চেয়ে আট-ন বছরের ছোট তো হবেই। সালেহ এবং সুজনদের আগ্রহ আমাকে পুনরায় আশান্বিত করে তুললো। আবার খোঁজ খবর শুরু হলো। পরিশেষে পাওয়া গেলো 'থাউজ্যান্ড আইল্যাণ্ডস' এ একটি ফ্লোটিং শ্যালে (floating chalet) - ভাসমান কটেজ। তিন বেডরুম, জলমুখী প্রশস্ত ডেক, ঠিক সেইন্ট লরেন্স নদীর পাদপ্রান্তে। কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে একেবারে পানির উপরে বসবাস করতে খানিকটা দ্বিধা হলেও অন্য কোন উপায় না থাকায় রাজি হয়ে গেলাম। তৎক্ষণাৎ তিন দিনের জন্য সেটি ভাড়া করে ফেললাম। সেদিনই মেইলে চেক পাঠাতে হলো। মালিক টাকা পাওয়ার পর কথা ফাইনাল হবে। আট দিন পর মালিক ই-মেইল পাঠিয়ে তার কনফরমেশন জানালো। আমরা সবাই উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটতে লাগলাম। দুই মাসের অপেক্ষা ভয়ানক দীর্ঘ মনে হলো।

গ্রীষ্মের প্রায় শেষে, এক উজ্জ্বল সকালে আমরা 'থাউজ্যান্ড আইল্যাণ্ডস' এর উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। সুজনদের গাড়ী নেই। আমরা ওদেরকে তুলে নিলাম। কলহাস্যে, সতেজ আলাপে গাড়ীর ভেতরের আবহাওয়া মুহূর্তে উষ্ণ হয়ে উঠলো।

'থাউজ্যান্ড আইল্যাণ্ডস' এলাকাটি সেন্ট লরেন্স নদী ও লেক ওন্টারিওর পূর্ব তীর জুড়ে অবস্থিত, কিছু অংশ কানাডায়, কিছু আমেরিকাতে। সহস্র ছোট বড় দ্বীপে পূর্ন এই জলাঞ্চলটি। সেই কারণেই এলাকাটির এমন চমৎকার নাম 'থাউজ্যান্ড আইল্যাণ্ডস' - হাজারো দ্বীপ। কানাডার দিকে কিংস্টন থেকে কর্নওয়াল পর্যন্ত তার বিস্তৃতি। আমেরিকার দিকে ওসওয়েগা থেকে ম্যাসেনা পর্যন্ত। দুনিয়াব্যাপি খ্যাতি এই এলাকাটির। পৃথিবীর নানান প্রান্ত থেকে টুরিস্টরা আসে এই 'হাজারো দ্বীপের' অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে।

আমাদের কটেজটি কারডিনাল শহরে। কিংস্টন থেকে আরো ১২০ কিলোমিটার পূর্বে। কারডিনাল পর্যন্ত হাইওয়ে ৪০১ ধরে চলে যাওয়া যায়। শহরে পৌঁছে স্থানীয় রুট ২ নিতে হবে। আমরা প্রথমে প্রেসকট থেমে কটেজের মালিকের সাথে দেখা করলাম। স্বামী ও স্ত্রী দু'জনে তাদের মোট চারটি কটেজ বছর জুড়ে ভাড়া দেয়। তাদের চমৎকার বসতবাড়ি দেখে বোঝা গেলো তাদের ভালোই চলে। লোকটি বাসায় ছিলো না। মহিলা তার ছয় মাসের ছোট মেয়েকে নিয়ে তার নিজস্ব ভ্যানে আমাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো। প্রেসকট থেকে কারডিনাল দশ-পনেরো মিনিটের পথ। ভাসমান কটেজগুলি রুট ২ এর উপরেই, একটি বাঁকানো নুড়ি বাঁধানো পথ ধরে প্রায় ফুট পঞ্চাশেক নীচে নামতে হয়। মূল নদীর একটি ছোট্ট প্রশাখায় ভাসমান কংক্রিটের বেসের উপরে ছিমছাম তিনটি বাসা। মাঝের বাসাটি আমাদের। অন্য দুটিতে স্থায়ী বাসিন্দা আছে। প্রশস্ত ডেকে দাঁড়িয়ে সামনে তাকাতেই মনটা ভরে গেলো। নদীর এই প্রশাখাটি বড় জোর দেড়শ' ফুট চওড়া। একটি ক্রমশ চিকণ হয়ে যাওয়া ভূমি মূল নদী থেকে আমাদেরকে পৃথক করেছে। বেশ সুন্দর একটি পার্ক তৈরি করা হয়েছে সেই ভূমিটুকুর উপরে। সারি সারি গাছপালার মাঝ দিয়ে মেঠো পথ এঁকে বেঁকে চলে গেছে অনেকখানি দূরে।

মালিকের স্ত্রী, কোরি, আমাদেরকে বাসার সবকিছু দেখিয়ে, চাবি গছিয়ে দিয়ে চলে গেলো। তার মেয়েটি কান্নাকাটি শুরু করেছে। আমি ঘড়ি দেখলাম। বিকাল তিনটা। সালেহ স্ত্রী রেখা ও নয়-দশ বছরের ছেলে জসিমকে নিয়ে সরাসরি নিউইয়র্ক থেকে আসছে। তাদের অনেক সকালে রওনা দেবার কথা। তারপরও বিকেল চারটার আগে পৌঁছাতে পারবে কিনা সন্দেহ। আমি দোতালার একটি বেডরুম তাদের জন্য রেখে অন্যটি দখল করলাম। সুজনদেরকে চালান করলাম নীচতলার বেডরুমে। তাদের তরুণ হৃদয়ে অকস্মাৎ আবেগের সঞ্চার হলে আমাদের উপস্থিতি নিয়ে তাদেরকে বিব্রত হতে হবে না।

সবাই বোচকা-বুচকি খুলে আগামী তিনটা দিন আলস্যভরে কাটানোর সংকল্প নিয়ে জেঁকে হাত পা ছড়িয়ে বসলাম। বিশাল প্যাটিও আমব্রেলার (Patio umbrella) নীচে গোল টেবিল ঘিরে সার বেঁধে চেয়ার বসানো। শিলি দ্রুতহাতে চা-নাস্তা বানিয়ে টেবিলে পরিবেশনা করতেই ফুরফুরে হৃদয় এবার গুনগুন করে গান গাইতে শুরু করলো।

বিকট ধমকানির শব্দে সঙ্গীতে ব্যাঘাত হলো। রেখা ভাবীর তীক্ষ্ণ কণ্ঠ চিনতে দেরি হলো না। সালেহ ও জসিম কানে আঙ্গুল দিয়ে ডেকে পদার্পণ করলো, রেখা ভাবী ঠিক তাদের পিছু পিছু। - "সেই কখন থেকে চরকির মতো ঘুরছে। কতবার বললাম কাউকে জিজ্ঞেস করো। নতুন জায়গা, চেনা জানা কেউ নেই। না, তাতে ওনার বেইজ্জতি হবে। নরাধম। গত

আধঘণ্টা ধরে অকারণে গাড়ীর মধ্যে পড়ে মরছি। আমার মামার সাথে বের হলে জীবনে কখনো এমন হতো না। এইসব গবেটদের সাথে রাস্তায় বের হওয়াই ভুল।"

আমি হাসিমুখে অভিবাদন জানাই - "কেমন আছেন ভাবী? জায়গাটা দেখেছেন? মারাত্মক না?"

রেখা মুখ কুঁচকালো। - "ভালোই তো দেখাচ্ছে। কিন্তু বাড়িঘর দুলছে কেন? পানির উপরে ভাসছে নাকি? আমি তো ভাবলাম মাটির সাথে আটকে দেয়া। ঝড়-টড় হলে মাঝ দরিয়ায় নিয়ে ফেলবে না তো? ভাই, আপনি এই সব আগে কখনো করেছেন ? মামাকে একটা ফোন লাগাবো? মামা বছরে দশবার কটেজে যায়, এইসব তার নখদর্পণে।"

সালেহ ভ্যাংচালো - "হ্যাঁ, হ্যাঁ, দুনিয়ার সবই তোমার মামার নখদর্পণে।"

- "একদম বাজে কথা বলবে না। ফাউ ঘুরিয়ে এনে আবার মুখের উপর কথা বলছো?"

একটি ফেরিবোট প্রচণ্ড শব্দে নদীতে বিকট ঢেউ তুলে ছুটে গেলো। সেই ঢেউয়ের ঝাপটা এসে লাগতে ভাসমান বাসা এপাশ ওপাশ দুলতে লাগলো। রেখা সজোরে সালেহকে জড়িয়ে ধরলো – "উল্টে যাবে নাকি গো? শক্ত করে ধরো আমাকে। আমি সাঁতার জানি না।"

একটা হাসির রোল উঠলো। রেখা ঠোঁট বাঁকালো। "এটা হাসির কিছু না। চারদিকে এতো পানি দেখে আমার কেমন নার্ভাস লাগছে।"

চা - নাস্তা খেয়ে রেখা কিঞ্চিৎ ধাতস্থ হলো। জসিম এইবার আমাকে চেপে ধরলো - "চলো আঙ্কেল, ফিশিং করি। বিগ বিগ ফিশ ধরতে হবে।"

উত্তম প্রস্তাব। আমাকে মাছ ধরবার সরঞ্জামাদি বের করতে দেখে সুজনও তার সদ্যক্রীত ছিপ বের করলো। আমার মৎস্য সংক্রান্ত আগ্রহ দেখে সেও বিশেষ রকম অনুপ্রানিত হয়ে এই অপকর্মটি করে ফেলেছে। সুনয়নার ব্যাপারটা বিশেষ পছন্দ হচ্ছে না। সে আমাকে দেখলেই নাকে হাত দেয় - "আপনার সর্বাংগে মাছের গন্ধ।"

সুজনের কপালে দুঃখ আছে!

স্থানীয় একটি ক্ষুদ্র ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে দুই বাক্স কেঁচো কিনে এনে আমরা কাজে লেগে গেলাম। ডেকের উপর থেকে পানিতে ছিপ ফেললাম। জসিমের মাছ ধরা দেখে জাকিরও উৎসাহ দেখা দিলো। তার জন্যে ছোটদের ছিপ কেনাই ছিলো। সব ঠিক ঠাক করে, কেঁচো লাগিয়ে বড়শি পানিতে ফেলে ছিপ তার হাতে ধরিয়ে দিলাম। - "টান দিলে বলবি।"

তার খুশী আর ধরে না। এমন ভয়ানক দায়িত্বপূর্ণ একটা কাজ তাকে দেয়া হয়েছে, তার বিশ্বাসই হচ্ছে না। বিধাতার কি লিখন। তার বড়শিতেই প্রথম মাছটা পড়লো। বেশ বড়সড় একটি সানফিশ, পোয়াখানেকতো হবেই। ছিপে টান পড়তে বেচারি চিৎকার শুরু করে দিল। আমি মাছ ডেকে তুলে ছিপ জাকির হাতে ধরিয়ে দিয়ে পটাপট ছবি তুলে ফেললাম। ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে বালতি ভরে গেলো 'সানফিশ' এ। সালেহও আমাদের দলে এসে ভিড়লো।

শেষ বিকালের চমৎকার হিমেল বাতাস মোলায়েম পরশ বুলিয়ে যাচ্ছে। হালকা ঢেউয়ের তালে তালে দুলছে আমাদের পাটাতন। ডেকের রেলিংয়ের সাথে বাঁধা কাঠের নৌকাটা দেখে লোভ হচ্ছে। কিন্তু কেউই ভালো সাঁতার জানি না। সাথে লাইফ জ্যাকেট দিয়েছে কিন্তু তবুও সাহস হচ্ছে না। নৌকা উল্টে পাল্টে গেলে কি হতে কি হয়। কটেজে একটু ফুর্তি করতে এসে জীবন বিসর্জন দিতে চাই না।

মাছ ধরে এমন দারুন সন্ধ্যাটা কাটানোর আগ্রহ মেয়েদের মধ্যে দেখা গেলো না। তারা আমাদের উদ্দেশ্যে কয়েকটি আপত্তিজনক মন্তব্য করে হাঁটতে বেরিয়ে গেলো। গন্তব্য সম্মুখের দ্বীপের মতো ছোট পার্কটা। আমাদের তিনদিকেই পানি ঘিরে থাকায় তাদেরকে উৎরাই বেয়ে উঠে, প্রধান সড়ক ধরে খানিকটা হেঁটে তবে আবার চড়াই বেয়ে নামতে হবে। তাদেরকে যেতে দেখে আমরা সকলেই আনন্দিত হয়ে উঠলাম। মাছুয়াদেরকে মাছের গন্ধ নিয়ে কটুক্তি করা মোটেই শোভন কাজ নয়। খাবার সময়তো বাছ বিচার করবে না।

সেদিন রাতে চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য সাবাড় করে অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা পিটিয়ে সবাই যখন বিছানায় গেলো, আমি তখন ছিপ নিয়ে আবার বের হলাম। আমাদের শ্যালে থেকে পঞ্চাশ - ষাট ফুট দুরে খাড়া টিলাটার ঠিক নীচের শান্ত পানির এলাকাটা দেখে পাইক মাছের আখড়া মনে হচ্ছিলো। মাছটা বাইন মাছের বড় ভাই জাতীয়, খেতে খুবই মজা। দু একটা ধরতে পারলে মনটা ভালো হয়ে যাবে। আমি উপরের রাস্তায় জ্বলে থাকা একটি ল্যাম্প পোস্টের ক্ষীণ আলোতে একাকি প্রায় ঘন্টাখানেক খুব চেষ্টা করলাম - বড়শি অনেকখানি দূরে পানিতে ছুড়ে ফেলি স্পুন (spoon) লাগিয়ে, ধীরে ধীরে রিল (reel) করে নিয়ে আসি। কোন লাভ হলো না। রাত একটার দিকে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে গেলাম।

পরদিন ভোরে উঠে আবার বের হলাম। ভোরবেলা, সূর্য উঠার ঠিক আগে হচ্ছে মাছ ধরার উৎকৃষ্ট সময়। টরোন্টোতে থাকতে সেই সুযোগ কখনই হয় না। সবচেয়ে নিকটবর্তি মাছ ধরবার ভালো লেক আধা ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার পথ। আমি নদীর তীর বরাবর হাঁটতে থাকি এবং আমার প্রচেষ্টা চালাতে থাকি। ঘন্টাখানেক পরে আমার সহিষ্ণুতা পুরস্কৃত হলো। একটা ৩-৪ পাউন্ডের পাইক মাছ পেলাম। পনেরো মিনিট পরে আরেকটি। চমৎকার! এদিকে শুনেছি বেশ বড় বড় ব্যাস মাছ আছে। তারা এক নম্বর স্পোর্টস ফিশ (sports fish)। সূর্য উঠবার ঠিক আগে আগে চারদিকে তাদের লম্ফ ঝম্ফ দেখে তাদের উপস্থিতির প্রমাণ পেলাম। কিন্তু ধরতে পারলাম না একটাও। তা হোক, যা পেয়েছি সেটাই বা মন্দ কি? মাছ দু'খানা হাতে ঝুলিয়ে বুক ফুলিয়ে দেড় কিলোমিটার পথ হেঁটে কটেজে ফিরলাম। কেউ তখনো বিছানা ছাড়েনি। আমি মাছগুলোকে রশিতে বেঁধে ডেকের গ্রিলের সাথে ঝুলিয়ে পানিতে ছেড়ে দিলাম। সবাইকে দেখিয়ে দু একটা ছবি না তুললে এই কৃতিত্বের প্রকৃত আনন্দটা কোথায়?

যদিও আমাদের উদ্দেশ্য ছিলো এখানে এসে একটু হাত পা খুলে কয়েকটা দিন কাটানো কিন্তু দেখা গেলো নাস্তা পর্ব সারা হতে সবাই বাইরে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো। 'থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড' এলাকাটি শুধুমাত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্যই বিখ্যাত নয়, তার ঐতিহাসিক মূল্যও প্রচুর। আমেরিকান রেভলুশনের সময় এবং পরে এই এলাকাটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলো। আমি আসবার আগেই স্থানীয় দর্শনীয় কয়েকটি স্থানের খবর নিয়ে এসেছিলাম। যদিও আমার ইচ্ছা ছিলো সারাদিন মৎস্য শিকার করে কাটানো, তবুও গণমতের বিরুদ্ধে যাবার সাহস পেলাম না। আমার স্ত্রী সাহেবানের মুখ একেবারে মধুর মতো না হলেও, রেখার তুলনায় নস্যি। রেখাকে কোন সুযোগ দিতে আমি রাজী নই। বিশেষ করে তার মামার কথা তুললেই সালেহের মতো আমারও শরীর চুলকাতে শুরু করে।

আমরা প্রথমে গেলাম প্রেসকটে ব্যাটল অব উইণ্ডমিল (battle of windmill) এলাকাটি পরিদর্শন করতে। প্রেসকটে এই এলাকা বিখ্যাত ফোর্ট ওয়েলিংটন এর জন্য। ব্রিটিশ আমলে স্থাপিত এই দূর্গটি শহরের প্রায় কেন্দ্রে অবস্থিত। সেখানে আমরা যাই পরে। কিন্তু প্রেসকটের ঐতিহাসিক মূল্য বোঝাতে হলে সমসাময়িক ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা না দিলে কোন কিছুই বলা হয় না।

১৭৭৬ সালে জুলাইয়ের ৪ তারিখে ম্যাসাচুসেটসের অন্তর্গত বোস্টনে কংগ্রেস আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মুক্তির সংগ্রাম অবশ্য শুরু হয়েছিলো তার আগেই। জর্জ ওয়াশিংটন ছিলেন কন্টিনেন্টাল আর্মির (Continetal Army) কমাণ্ডার ইন চিফ (Commander in Chief)। তাঁর নেতৃত্বে যুদ্ধ চলে পরবর্তি সাত বছর। ১৭৮৩ সালে ব্রিটিশ বাহিনী আমেরিকা ত্যাগ করে। তাদের সাথে সাথে নতুন ভূমিতে পাড়ি জমায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি অনুগতরা। ১৭৮৪ সালের গোড়ার দিকে তারা সেন্ট লরেন্স নদীর পারে অবস্থিত প্রেসকটে একত্রীভূত হয়। নদীর ওপারে আমেরিকা, এপারে কানাডা। সেন্ট লরেন্স নদীর ভূমিকা অসাধারণ। গ্রেট লেক্স্ - লেক অন্টারিও, লেক ইরি, লেক হিউরন, লেক মিসিগান ও লেক সুপিরিয়র এর সাথে মন্ট্রিলের যোগাযোগের জন্য এবং মালপত্র পরিবহনের জন্য এই নদীপথটির ব্যবহার অপরিহার্য। যে কারণে তাদের আশংকা ছিলো আমেরিকানরা হয়তো সুযোগ পেলেই কানাডিয়ান পোর্টগুলি আক্রমণ করে দখল করে নেবার চেষ্টা করতে পারে। সেক্ষেত্রে ব্রিটিশ জাহাজগুলির এই পথে চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে এবং তাদের পক্ষে সমরাস্ত্র ও অন্যান্য মালামাল দুরবর্তি এলাকাগুলোতে চালান করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে। প্রাথমিকভাবে স্থানীয় মিলিশিয়ারা দু'টি দালান দখল করে একটি সাময়িক দূর্গ তৈরী করে। পরবর্তীতে সেখানে দু'টি নাইন-পাউন্ডার (9-pounder) কামানও এনে বসানো হয়। পরে, ১৮১২ সালে নর্থ আমেরিকায় ব্রিটিশ বাহিনীর কমান্ডার স্যার জর্জ প্রিভস্ট সেখানে একটি পুরোদস্তর সামরিক দূর্গ স্থাপনের আদেশ দেন। সেখান থেকেই ফোর্ট ওয়েলিংটনের গোড়াপত্তন।

'ব্যাটল অব উইণ্ডমিল' পরিদর্শনে গিয়ে প্রশস্ত সেন্ট লরেন্স নদীর পাথুরে তীরে দাঁড়িয়ে থাকা প্রায় পঞ্চাশ-ষাট ফুট উঁচু একটি লাইট-হাউস দেখে আমরা সকলেই বেশ মোহিত হলাম। ভেতরে সুভেনিরের দোকান। সিঁড়ি বেয়ে একেবারে উপরে উঠে যাওয়া যায়। একটি অল্প বয়স্ক যুবক আমাদেরকে স্বাগত জানালো। কিছু তার মুখে এবং কিছু একটা ভিডিও দেখে বেশ একটা ধারণা পাওয়া গেলো বিখ্যাত 'ব্যাটল অব উইণ্ডমিল' এর।

প্রতিবেশি আমেরিকা স্বাধীনতা অর্জন করলেও কানাডা ব্রিটিশ কলোনির অংশ হিসাবেই থেকে যায় পরবর্তী কয়েকটা যুগ। কানাডার শাসকগোষ্ঠি ছিলো হাতে গোনা কিছু অভিজাত পরিবার। কিন্তু ধীরে ধীরে আরো গণমুখী শাসনতন্ত্রের দাবি জোরদার হচ্ছিলো। ১৮৩৭ সালে এইসব দাবি এবং অসন্তোষ থেকে একটি বিদ্রোহেরও সূচনা হয়। ব্রিটিশ আর্মির হাতে তারা অবশ্য সহজেই পরাভূত হয় এবং ওপারে পালিয়ে যায়। ১৮৩৮ সালে এই বিদ্রোহীরা এবং তাদের বেশ কিছু আমেরিকান সমর্থকরা সেন্ট লরেন্স নদীর ওপারে জোট বাঁধে এবং নভেম্বরের ১২ তারিখে প্রেসকট আক্রমণ করে। তারা সংখ্যায় অল্প থাকলেও আচমকা আক্রমণ করে প্রেসকট উইন্ডমিল [বর্তমানে লাইটহাউস] এবং কিছু স্থানীয় দালান কোঠা দখল করে নেয়। তাদের ধারণা ছিলো স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের সাথে হাত মেলাবে। কিন্তু বাস্তবে তা হলো না। খুব শীঘ্রই ফোর্ট ওয়েলিংটন থেকে ব্রিটিশ সৈনিকরা এসে তাদেরকে পরাভূত করে এবং বন্দী করে। জীবিতদের এগারোজনকে হত্যা করা হয়, ষাটজনকে পাঠানো হয় অস্ট্রেলিয়ায়। যুদ্ধের পর উইন্ডমিলটি আর্মি পোস্ট হিসাবেই ব্যবহৃত হচ্ছিল। ১৮৭২ সালে এটিকে লাইটহাউসে রুপান্তরিত করা হয়।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে আমাদের সম্পূর্ণ দলটা ধীরে ধীরে উপরে উঠলো। ভেতরে ইটের গায়ে এখনো বুলেটের চিহ্ন প্রথিত। তাদের ঐতিহাসিক মূল্যকে ধরে রাখবার জন্যই সেই চিহ্নগুলোকে সযত্নে সংরক্ষণ করা হয়েছে। একেবারে উপরে উঠতেই সেন্ট লরেন্স নদীর দমবন্ধ করা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের এক অপূর্ব ঝলক চোখে পড়লো। সেখানে বেশ কিছু ছবি তুলে আমরা গেলাম ফোর্ট ওয়েলিংটন দেখতে।

স্বাভাবিকভাবেই ঠিক নদীর পাশেই অবস্থিত দূর্গটি। প্রশস্ত একটি মাঠের মাঝখানে চারদিকে উঁচু করে কাঠের বেড়া দেয়া। শুধুমাত্র সামনের দিকে উঁচু করে মাটির ঢিবিমতো বানানো হয়েছে। সেই ঢিবির উপরে বেশ কয়েকটি কামান বসানো।

ভেতরে গার্ডদের থাকার স্থান, সৈনিকদের বসবাসের দালান এবং আরো কয়েকটি ছোটখাটো ঘর। সবুজ ঘাস এবং বিশালকায় বৃক্ষে পরিবেষ্টিত দূর্গের অভ্যন্তর দেখে ঝট করেই ভালো লেগে যায়। দূর্গের ভেতরে তরুণ-তরুণীরা সপ্তদশ শতকের পোশাক-আশাক পরে বিভিন্ন ধরণের কর্মকান্ডে অংশ নিচ্ছে। বেশ কয়েকজন তরুণ প্রথাগত ব্রিটিশ গার্ডের পোশাকে সেই আমলের রাইফেল হাতে প্রহরায় নিযুক্ত। আকাশে ব্রিটিশ পতাকা পত পত করে উড়ছে। সব কিছু সুচারুভাবে পরিকল্পিত। দেশ-বিদেশ থেকে টুরিস্টরা আসে এই দূর্গ দর্শনে। তাদেরকে বর্তমান থেকে কয়েক শ' বছর পিছিয়ে নিয়ে গিয়ে এক বিরল অভিজ্ঞতা দেবার জন্যেই এই প্রয়াস। জসিম ও জাকি বন্দুকধারী গার্ডের কাঁধে ঝুলে পড়ে বেশ কয়েকখানি দন্ত বিকশিত ছবি তুললো। তরুণ অভিনেতাও তাদের কান্ড দেখে ফিক ফিক করে হেসে উঠলো। মাটির চুলায় একদল তরুণী সেই সময়ের আটার কুকি (cookie) বেক করছিলো। টপাটপ কয়েকটা সাবাড় করে দিলাম। ভালোই লাগলো।

প্রচুর ছবি তুলে যখন আমরা সেখান থেকে বের হলাম তখন বিকেল। সবারই পেট চোঁ চোঁ করছে। পাশেই শহর। রেষ্টুরেন্টের সংখ্যা অতি অল্পই। একটি চাইনিজ বুফে'র দর্শন পেয়ে হৈ চৈ করে ভেতরে ঢুকলাম। অতি শীঘ্রই আমাদের অধিকাংশেরই প্রাথমিক উত্তেজনা কেটে গিয়ে উদ্বিগ্নতা দেখা দিলো। অধিকাংশ খাবারেই পর্ক (pork) দেয়া। চোর বাছতে গা উজাড় হয়ে যাবার দশা হচ্ছে। সেভাবেই যে যা পারলো খেয়ে নিলো। রাতে ভূরি ভোজন দিলেই চলবে। আমাকে অবশ্য প্রচুর গঞ্জনা সহ্য করতে হলো। অপরাধ এই টুকুই যে আমিই দোকানটা প্রথম দেখেছিলাম। আমার ধর্মভয় অল্পই; কিন্তু ক্ষুধার্ত। আমি পেটপুরে খেলাম।

বিকালে বাসায় ফিরে নৌকাটার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। সাঁতার যেটুকু জানি তাতে ফুট ত্রিশেক যেতে পারবো। তারপরেই টুপ করে ডুবে যাবো। তবুও সাহসে বুক বেধে লাইফ জ্যাকেটটি শরীরে চাপিয়ে সাবধানে পা রাখলাম পাটাতনে। শিলিও অনেক চিন্তাভাবনার পর আমাকে অনুসরণ করলো। জাকির জলভীতি আছে। সে নৌকার ধারে কাছেও এলো না। দু'জনে দুই বৈঠা নিয়ে শম্বুক গতিতে নদীর তীরের খুব কাছ দিয়ে ঘুরতে লাগলাম। কয়েকবার তাল-বেতাল হয়ে আমাদের দুজনারই যেন বৈঠা চালানোতে হাত খুলে গেলো। শীঘ্রই আবিষ্কার করলাম এই শাখা নদীর মাঝখানে পানির গভীরতা বেশী থাকলেও তীরের দিকে চল্লিশ-পঞ্চাশ ফুট এলাকার গভীরতা চার-পাঁচ ফুটের বেশী হবে না। নৌকা উল্টে গেলেও পায়ের উপরে দাঁড়িয়ে থাকা যাবে। আমাদের মুখে হাসি ফুটলো। বেশ খানিকটা দূরে কয়েকটা গাছের ছায়ায় এক ঝাঁক গোলাকৃতি শাপলা পাতার মাঝে একটি ফুল ফুটে আছে। আমরা প্রবল উৎসাহ নিয়ে ফুলটাকে তুললাম।

আমাদের এই রোমান্টিক নৌবিহার দেখে সালেহের বেশ একটা আগ্রহ দেখা দিলো। রেখা তার প্রস্তাবে মুখ ঝামটা দিলো - "বাজে কথা বলো না। সাঁতারের স জানি না দুজনার একজনও। নৌকা ডুবলে জীবন শেষ। ঐসব 'লাইফ জ্যাকেট' এ কাজ হয় নাকি। থাকতো মামা, চোখ বুজে যেতাম। ইংলিশ চ্যানেল পার হয়েছেন সাঁতরে ----- ।"

সালেহ বিরস মুখে বললো - "হ্যাঁ, ইংলিশ চ্যানেলের পানিতে পা ডুবিয়েছিলেন একবার।"

"বাজে কথা বলবে না। একদম না। আমার মামার নখের যুগ্যি হতে পারবে তুমি ----- "

সুজন ও সুনয়নার নৌকায় চড়বার কোন আগ্রহ দেখা গেলো না। দুজনকেই ফ্যাকাশে দৃষ্টিতে নৌকাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে আমি আর জোরাজুরি করলাম না। একটু পরেই আবিষ্কার করলাম তারা দু'জনে হাত ধরে নিকটবর্তি টিলাটার উপরে একটু নির্জনতা খুঁজছে। মাত্র একদিনেই জসিম তাদের ভয়ানক নেওটা হয়ে গেছে। সে আতিপাতি করে চারদিক খুঁজতে খুঁজতে তাদের দু'জনকে আবিষ্কার করলো। আমার নিষেধে কোন কর্নপাত না করে ছুটলো সে। তার সঙ্গ নিলো জাকি। এই পিচ্চিগুলোর যদি কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকে।

রাতে গরুর পাজরের বারবিকিউ (BBQ) দিয়ে মহা ভুরিভোজন হলো। সাথে শিলির হাতে বানানো পিজা। এই জাতীয় রান্নায় তার বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে। অনেকেই ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকে শিখবার জন্য।

পরদিন আমরা গেলাম নিকটবর্তী শহর ইরোকুয়া (Iroquois) এ সি-লক (sealock) দেখতে। গ্রেট লেক এর অন্তর্গত একেকটি লেকের পানির উচ্চতা সি লেভেল থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের। সেইন্ট লরেন্স নদীর থেকে সেগুলি পৃথক। নৌচলাচলের জন্য প্রচুর অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয় করে বেশ কিছু লক তৈরী করেছে কানাডিয়ান সরকার। প্রতিটি লেকে পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে চলাচলকারী জাহাজ বা বোটকে উপরে নীচে করা যায়। সুতরাং কম উচ্চতার একটি জলবক্ষ থেকে অধিক উচ্চতার জলবক্ষে একটি জলতরীকে পার করবার জন্য পানির পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়া হয়। বিপরীত দিকের জন্য পানির পরিমাণ কমানো হয়। এই লকগুলি থাকাতেই সেইন্ট লরেন্স নদীর সাথে সবগুলি লেকের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে।

ইরোকু য়ার লকটি অসম্ভব সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত। প্রায় শ' খানেক ফুট উঁচু পাহাড়ের উপরে চমৎকার প্রশস্ত একটা পার্ক। এই পার্কের প্রান্তে অবস্থিত রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে নীচের লকটির পরিপূর্ণ অবয়বটা দেখা যায়। আমরা থাকতে থাকতেই দু'টি জাহাজ লকের চিকণ চ্যানেল দিয়ে খুবই ধীর গতিতে পার হলো। দু'দিকের বিস্তৃত নীল জলরাশি, সবুজ গাছপালায় ছাওয়া আদিগন্ত তীর এবং রৌদ্রোজ্জ্বল নীলাভ আকাশ আমাদের সবারই মন কেড়ে নিলো। লক্ষ্য করলাম সুজন ও সুনয়না এক সুযোগে পার্কের পার্শ্ববর্তী একটি বিশাল কবরস্থান পরিদর্শনে চলে গেছে। তাদের পিছু পিছু ছুটলো জসিম ও তার ছায়াসংগী জাকি।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই মনটা খারাপ হলো। আজই দুপুরের মধ্যে বাক্স পেটরা গুছিয়ে আমাদেরকে যে যার ঘরে ফিরতে হবে। কেমন করে যেন ক'টা দিন কেটে গেলো টেরও পাই নি। সবারই খারাপ লাগছে, বুঝলাম। দৈনন্দিন জীবনের সহস্র ঝামেলা পেছনে ফেলে এসে এমন প্রাকৃতিক পরিবেশে সময় কাটানোর চেয়ে তৃপ্তকর অভিজ্ঞতা আর কি হতে পারে? নাস্তার পর সালেহ্ নৌকায় উঠবার প্রস্তাব দিতে সবাইকে অবাক করে দিয়ে রাজী হয়ে গেলো রেখা। বোঝা গেলো তার হৃদয়েও বিদায়ের ব্যথাতুর সংগীত বেজে উঠেছে। যাবার আগে যেটুকু আনন্দ নেয়া যায়। সালেহের হাতে বৈঠা। রেখা আগেই বলেছে সে নৌকায় উঠে আঙ্গুল নাড়তেই রাজি নয়। তার আড়ষ্ট ভঙ্গি দেখে কারণটা বুঝতে কারো অসুবিধা হলো না। শিলি সাধারণত খুব হিসেব করে ঠান্ডা মশকরা করে। সেও খিল খিল করে হাসতে হাসতে বললো - "রেখা ভাবী, আপনার কাঁপুনিতেই নৌকা ডুবে যাবে।"

রেখা ভীতচকিত চাহনি দিলো। কোন কথা বলবার সাহস হলো না। সালেহ সাহসী মুখে বৈঠায় টান দিলো। নৌকা মোলায়েম গতিতে পানির বুক চিরে এগিয়ে গেলো। প্রথম কয়েকটা মিনিট ভালোই চললো সব কিছু। কিন্তু উত্তেজনার বশে জোরে বৈঠা চালাতে গিয়েই সর্বনাশ করলো সালেহ। স্রোতের টানে নৌকা দুলতে শুরু করতেই চিৎকার করে বিপরীত দিকে ওজন চাপানোর চেষ্টা করলো রেখা। সালেহ ও তার সম্মিলিত ওজনে নৌকা কাত হয়ে পড়লো। স্লো মোশন ছবির মতো দু'জনেই ধপাস করে পড়লো পানিতে। নৌকা অল্পের জন্য উল্টালো না। আমরা হো হো করে হেসে উঠলাম। তাদের দু'জনকে কোমর সমান পানিতে দাঁড়িয়ে হাতাহাতি করতে দেখে আমাদের সবারই যে হৃদয় প্রফুল্ল হয়ে উঠবে তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে? এতো দূর থেকেও রেখার তীক্ষ্ণ কণ্ঠের খিস্তি শুনতে পাচ্ছি - "ছি ছি, ইচ্ছে করে পানিতে ফেললে? মানুষজনের সামনে এমন হেনস্থা করলে? লজ্জা করছে না হাসতে? উজবুক কোথাকার! বাসায় ফিরেই মামাকে ফোন করবো - ------ "

আমরা আরেক দফা হাসিতে ফেটে পড়ি।

দুপুরের খাবার খেয়ে মালিকের বাসায় কটেজের চাবি সোপর্দ করে রাস্তায় নামলাম আমরা। সালেহরা থাউজ্যাণ্ড আইল্যান্ড বর্ডার দিয়ে আমেরিকা ঢুকে যাবে, আমরা ফিরে যাবো টরোন্টোতে। বিদায়ের সময় সবাই হাসিমুখে হাত নাড়লাম।

হাইওয়েতে উঠেই গাড়ী ছুটিয়ে দিলাম দুর্বার বেগে। আজ রোববার, উইক এণ্ডে যারা বেড়াতে বেরিয়েছিলো টরোন্টো থেকে তারা সবাই ফিরতে শুরু করবে। খুব শীঘ্রই ভীড় হয়ে যাবে রাস্তায়। তিন ঘণ্টার পথ পাঁচ ঘন্টা লাগবে। ভীড় বাড়ার আগেই পৌঁছে যেতে চাই। পিছে পড়ে থাকলো চমৎকার এক টুকরো স্মৃতি।

স্বপ্নের নাগরদোলায় দুলতে দুলতে স্বপ্নপুরীতে মাত্র পৌঁছেছি। এমন সময় এক ডাকিনীর তীক্ষ্ম চিৎকারে নিদ্রার জগৎ থেকে রুঢ় বাস্তবে পদার্পণ করলাম। মহারাণী এবং শাহজাদার নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটানোর আগেই ডাকিনীর টুটি চেপে ধরলাম। পৌনে আটটা। গ্রীষ্মের সূর্য ইতিমধ্যেই প্রায় মধ্য গগন ছুঁই ছুঁই। কিন্তু যার নিদ্রাপুরীতে পাড়ি জমাতে জমাতেই রাত দ্বিপ্রহর হয় তার জন্য এটা এক প্রকার ভোরের শামিল। আঠার মতো সেটে থাকা চোখের পাপড়িগুলোকে ফাঁক করে ওয়াশরুমের দিক ঠাহর করি। প্রাতঃকর্ম সারতে সারতে আরেকটা চুটকি ঘুম হয়। সকালে শরীরে পানি লাগানো আমার স্বভাব নয়। এই আছি এই নাই দাঁতে বাহারি সারি দুইখানিতে ব্রাশের দুই ঘষা দিয়ে, কোনোক্রমে শার্ট-প্যান্টের ফাঁদে নিজেকে জড়িয়ে, জুতায় পা দুইখানা গলিয়ে, একখানা সস্তা কালো ব্যাগ বগলদাবা করে অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলে করিডোরে বেরিয়ে আসি।

হেড়ে গলার সম্বোধনে চমকে উঠি। মাঝবয়েসী ইনডিয়ান ভদ্রলোকটিকে চিনতে পারি। আমাদের তিন চারটি অ্যাপার্টমেন্টের পরেই তার বাস। পুত্রের সংসারে আছেন। অল্প কিছুদিন ধরেই তাকে দেখছি। প্রায়ই লম্বা করিডোরে চঞ্চল পায়ে হাঁটাচলা করেন। দেখলেই হই হুল্লোড় ফেলে দেন। বেচারীর বোধ হয় আলাপ করার মানুষ নেই। আমি মধ্যম মানের আলাপী। কিন্তু এই সাত সকালে তার সঙ্গে আলাপে জড়ানোর বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই। মুচকি হেসে কেটে পড়ছিলাম। কাঁধে থাবা পড়তেই বাধ্য হয়ে থামতে হলো।

"কাল ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। ব্লাড প্রেশার অনেক কম। ডাক্তার বললো, নো চিন্তা। হাঃ হাঃ হাঃ। বলেছিলাম না তোমাকে? হাটার কতো ফল।"

তার ইংরেজি অতিশয় দূর্বল। অধিকাংশ আলাপ হিন্দিতেই চলে। আমি কিছু হিন্দি বুঝলেও আদৌ বলতে পারি না। তবুও হোঙ্গে-দেঙ্গে বলে চালিয়ে যাই। আপাতত বিড়বিড়িয়ে কিছু বলে কেটে পড়লাম।

ডাউন-টাউন টরোন্টোতে কাজ। পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন ব্যবহার করি। যেতে ঘন্টা দেড়েক লেগে যায়। দাঁড়িয়ে এই ভদ্রসন্তানের কেচ্ছা শুনতে গেলে দিন গড়িয়ে যাবে। ড্রাইভ করার কথা কখনো মনে আসেনি তা নয়। কিন্তু অফিসযাত্রীদের গাড়ির ভীড়ে রাস্তায় তিল ধারণের জায়গা থাকে না। ঢিলে তালে চলতে চলতে ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গে। পার্কিংয়ের খরচে পকেট ফুটো হয়। তার উপর রয়েছে গাড়ির পরিবর্ধিত ইনশিওরেন্সের ধাক্কা। আমার গণপরিবহনই সই। এখানে তার নাম 'টিটিসি' (TTC)।

আমার যাত্রা শুরু হয় বাসে। তিনবার ট্রেন পাল্টে তবে গন্তব্য। বাসের জন্য আজ লম্বা লাইন পড়ে গেছে লক্ষ্য করলাম। একেকদিন একেক রকম হয়। অনেক গবেষণা করেও জনগণের মতিগতি বুঝতে পারিনা। বাস একটা থামতেই হুড়োহুড়ি লেগে গেল। যদিও সকলেই চেষ্টা করে ভদ্রতা বজায় রাখতে তবুও একখানা সিটের জন্য দুই চারজনকে অল্পবিস্তর ঘাই -গুতা দেয়ায় অপরাধটা কোথায়?

আমার কপালে আজ সিট জুটলো না। কোনক্রমে যে এক কোণে ঠাঁই পেলাম তাতেই সন্তুষ্টি অনুভব করি। উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম, ঈশান-নৈর্ঋত সবদিকেই মানব সন্তানের উপস্থিতি। কেউ ধলা, কেউ কালা, কেউ কিঞ্চিৎ রঙচটা। ঠিক

সামনেই দাঁড়িয়ে তাল গাছের মতো এক কৃষ্ণাঙ্গ, তার চাছাছোলা চান্দি বাসের ছাদ প্রায় ছুঁয়ে যায় । তাল গাছের বগল ঘেষেই একটি নিরীহ দর্শন বীণা । নারী-পুরুষ, তরুণ-তরুণী, শিশু সব মিলিয়ে বর্ণ, আকার এবং প্রকৃতির বিচিত্র এক সন্ধিক্ষণ । মনটা অকারণেই যেন ভালো হয়ে ওঠে । এমন অপেক্ষাকৃত শান্তিময় বর্ণের সমাবেশে সাধারণ মানুষের হৃদয় মহামিলনের গান গেয়ে উঠবে সেটাই স্বাভাবিক । এই বৃহত্তর অস্তিত্বের অংশ হতে পেরে নিজের অজান্তেই যেন কিছুটা অহংকার বোধ করি ।

সকালের অফিসগামী গাড়ির ভিড় ঠেলে থমকে থমকে এগিয়ে চলে আমাদের বাস । পরের ষ্টেশনে আরো একঝাঁক মানুষের আগমন, চাপাচাপি, উষ্ণতা । সেই ভিড়ের মধ্যেও আমাকে শনাক্ত করতে অসুবিধা হলো না সেলিমের, ঠেলতে ঠেলতে পাশে চলে এলো ।

"কেমন আছেন ভাই? অফিসে চললেন? ভালোই আছেন আপনি ভাই । আমার কি দূরবস্থা দেখেন ।"

সেলিম ঢাকাতে কোনো একটি বড় প্রতিষ্ঠানের কমপিউটার সেকশনের হর্তাকর্তা ছিল । বয়স যদিও অল্পই । কি কারণে এই দূর দেশে আগমন জানা নেই । কিন্তু এখানে আসা পর্যন্ত নানান ঘাটের পানি খেয়ে চলেছে সে । এখন চলেছে স্কারবোরো মলে । সেখানে একটি দোকানে কাজ করে সে । আমি যথেষ্ট অপরাধী বোধ করি । যদিও জানি অল্প কয়েকখানি সিঁড়ির ধাপ টপকাতে আমাকে যে অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে গত একটি দশক তার কিয়দংশও এই তীক্ষ্ম বুদ্ধির যুবকটি এখনো উপলব্ধি করেনি ।

সেলিম কণ্ঠে তিরস্কার নিয়ে বললো, "আমার জন্য কিছুই করলেন না ভাই ।"

আমার সুযোগ যে কতো সংকীর্ণ তা সেলিমকে বোঝানোর চেষ্টা করি না । এক সঙ্গেই বাস থেকে নামি । দুজন দুই দিকে চলে যাই । আমি সিঁড়ি টপকে উপরে উঠি ট্রেন ধরতে । এই ট্রেন আমাকে নিয়ে যাবে কেনেডি সাবওয়ে স্টেশনে । আন্ডারগ্রাউন্ড রেল । কেনেডিতে ট্রেন থেকে নেমেই জানবাজি রেখে সিড়ি টপকে নিচে নামি । ট্রেন ধরতে পেরে মুখে হাসি ফোটে । অল্পক্ষণ পরেই স্টেশন পেছনে ফেলে সংকীর্ণ টানেলে প্রবেশ করে পাতালপুরীর যন্ত্রশকট । ঝিকির ঝিক, ঝিকির ঝিক । ভেতরের আলোকিত পরিবেশে চারদিকে দৃষ্টি বোলাতে নজরে পড়ে অসংখ্য অফিস যাত্রীদের সহিষ্ণু মুখগুলো । চায়নিজ, শ্বেতাঙ্গ, দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয় এবং অল্প কিছু কৃষ্ণাঙ্গ । সুবেশী নর এবং নারীদের ভিড়ে মিশে গিয়ে আতিপতি করে হাতলের সন্ধান করি । প্রায়ই কঠিন ব্রেক কষে ড্রাইভাররা, হাতলে হাত জড়িয়ে না থাকলে হুমকি খেয়ে পড়ার সম্ভাবনা দৃঢ় । খুঁজে খুঁজে সুন্দরী রমণীদের শরীরে হুমড়ি খেয়ে পড়ার এক অভাবনীয় প্রতিভা আবিষ্কার করার পর হাতল ধরার ব্যাপারে আমি বিশেষ রকম মনোযোগী হয়ে উঠেছি ।

সাবওয়েতে প্রায়ই পরিচিত মানুষদের মুখোমুখি পড়ে যেতে হয় । ঘন ঘন কাজ পাল্টানোর ফলে পরিচিত মানুষের সংখ্যা দ্রুতহারে বেড়ে চলে । যদিও ঘনিষ্ঠতা হয় অল্পই । ক্ষ্যাপে কাজ করার এটাই অসুবিধা । কপালের কি লিখন, আজ খুঁজে পেতে রজনের মুখোমুখিই পড়লাম । সেও বয়সে আমার চেয়ে তরুণ । কাজ নিয়েই কানাডা এসেছিল বহু বছর আগে । ঝানু হয়ে গেছে । তার একটিই বদঅভ্যাস, সে আচমকা অদ্ভুত সব প্রশ্ন করে বসে । আজ আমাকে দেখেই সে ফট করে জানতে চাইলো, "ঘন্টায় কতো করে দেয় তোমাকে?"

বিমূঢ় হই । নারীর বয়স আর পুরুষের বেতন এই দুটি তথ্য যে জানতে চাইতে হয় না, এ তো দুধের শিশুও জানে । কোনো এক অজানা কারণে ইনডিয়ান ছেলেগুলো এসবের ধার ধারে না । তারা প্রথম পরিচয়েই মানুষের বেতন জিজ্ঞাসা করে বসে থাকে ।

রজনের এই আচমকা প্রশ্ন কয়েকদিন আগের একটি ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। চতুর্বর্ষীয় পুত্র হঠাৎ করেই নিজ পৌরুষত্ব নিয়ে সচেতন ও কৌতুহলী হয়ে উঠেছে লক্ষ্য করলাম। হঠাৎ তার উত্তেজিত হই চই শুনে দৌড়ে গেলাম। সে তার অন্ডকোষ চাপতে চাপতে চিৎকার করছে, "আব্বু, দেখো দেখো, আমার এখানে বল আছে। তোমার আছে?"

রজন উত্তর না পেয়ে একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলো।

তাকে নিবৃত্ত করতে বিড়বিড়িয়ে কিছু একটা বলে এড়িয়ে গেলাম।

আমার ষ্টেশন এসে গেছে। ব্লর। এখানে ট্রেন পাল্টাতে হবে আবার। ছুট ছুট। সিঁড়ি টপকে নিচে নামতে হয়। দূর থেকেই কানে বাজে গিটারের ধ্বনি। একটি পুরুষালি কণ্ঠস্বর গভীর আবেগে গান গাইছে। সুর এবং বেসুরের বাঁধ মানার প্রয়োজন তার নেই। তাকে আমি প্রায়ই দেখি। আরো অনেক ভিখারি শিল্পীর একজন সে। কেউ গান গায়, কেউ বাদ্য বাজায়, কেউ সুর তোলে বাঁশিতে। কারো হৃদয়ে আলোড়ন উঠলে থমকে দাঁড়িয়ে দান করে যায়। এই অধমের অর্থে এমনই আসক্তি যে, একটি সিকিও কখনো এই দরিদ্র শিল্পীদের দান বাক্সে পড়েনি। নিজেকে আজ হঠাৎ করেই খুব ছোট মনে হয়। মাথা নিচু করে দ্রুত পাশ কাটিয়ে যাই। মানিব্যাগের প্রত্যন্ত কোনো প্রান্তরে জমতে থাকা ভাঙতি বের করতে করতে ট্রেন মিস হবে। মেজাজটা খারাপ হবে।

বস্তুত আলস্যের জয় হয়। কিন্তু অচেনা-অজানা ভিখারি শিল্পীগুলোর প্রতি প্রচুর শ্রদ্ধাবোধ অনুভব করি।

আরেকটি সংক্ষিপ্ত ট্রেনযাত্রার শেষে যে স্টেশনে পদার্পণ করলাম তার নাম যথার্থ অর্থেই রাজকীয়, কিং। আবার হুটোপুটি, লুটোপুটি, ভিড় ঠেলে সংকীর্ণ সিড়ি বেয়ে আলোকিত জগতে প্রবেশের জন্য সবাই উদগ্রীব। সিঁড়ির ওপর সিঁড়ি ঠেলে যখন রাস্তায় উঠে আসি, শরীরে শির শিরে ঘামের অনুভূতি হয়। প্রতিদিনের বরাদ্দ ব্যায়ামের কিয়দংশ এ চলাচলেই হয়ে যায়।

আমি কাজ করি টরোন্টো ডমিনিয়ন সেন্টারের কোনো একটি দালানে। এই এলাকাটি যেন একটি ফাইনানশিয়াল প্রাণকেন্দ্র। চারদিকে বিভিন্ন ব্যাংকের বহুতল আধুনিক ভবন। ডানে-বামে সামনে পেছনে স্কশিয়া ব্যাংক, টিডি ব্যাংক, সিবিসি, ব্যাংক অফ মনট্রিঅল....। চারদিকে অজস্র সুবেশী মানুষদের ভিড়। সকলেই ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে চলেছে কর্মস্থলের দিকে। কতো অসংখ্য ব্যর্থ মনোরথ নবাগতদের দীর্ঘ নিঃশ্বাস এই আপাতদৃষ্টিতে নির্মল বাতাস বহন করে চলেছে কে জানে? অনেকের কথাই মানসপটে ভেসে ওঠে। শিক্ষা-দীক্ষার কমতি নেই; কিন্তু এই নতুন ভূমির অলিখিত নিয়ম-কানুনের মারপ্যাঁচে তাদেরকে নাম লেখাতে হয়েছে দোকান, রেস্টুরেন্ট, কলকারখানায়। অপরাধ বোধটা আবার জাঁকিয়ে বসে।

ইয়াং স্ট্রিট হচ্ছে টরোন্টোর জীবন কাঠি। অজস্র অফিস বিল্ডিং পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে থাকি নিজ কর্মস্থলের দিকে। সেখানে একটি চেয়ার ও ডেস্ক অপেক্ষা করে আছে আমার জন্য। কাছেই সিএন টাওয়ারের শুলের মতো তীক্ষ অবয়বটি যেন আকাশ ফুঁড়ে উঠে গেছে মধ্য গগনে। একটি নন্দনীয় দৃশ্য। আচমকা একটি শূন্য হ্যাট ঠিক আমার সম্মুখে এসে স্থির হয়। ধাতস্থ হয়ে তাকাতেই টুপিধারী শীর্ণ হাতটিও নজরে পড়ে। একটি ভিখারি। গৃহহীন। পথেই তার সংসার। বেশ কয়েকজনকে দেখেছি শুধু এই ছোট্ট এলাকাতে। আমার দেখা অধিকাংশই শ্বেতাঙ্গ। দুর্বোধ্য হলেও সত্য। অনেকের সঙ্গী থাকে বিশালদেহী সারমেয়। নিঃসঙ্গ এক গৃহহীন পুরুষ ও একটি সারমেয় - দৃশ্যটি কাব্যিক হলেও সেখানে বিষাদই বেশি। এই দেশে সরকার নানাভাবে গৃহহীনদেরকে সাহায্য করার চেষ্টা করে বলে শুনেছি, তাদের প্রচেষ্টায় যে বিস্তর ত্রুটি আছে, স্বচোখে দেখছি। ভিক্ষা দিতে আমার বাধে। খুব সম্ভবত স্বদেশে যেমন দ্রুত হারে এর বিস্তৃতি দেখেছি তাতে হৃদয়ে শংকা জাগে এই প্রথম বিশ্বেও সেই অবক্ষয়ের জয়যাত্রা শুরু হয় কি না।

আমার কর্মস্থলের দালানটিও বহুতল। ঠিক তার সামনেই আরেকজন গৃহহীনকে ফুটপাথের ওপর সটান শুয়ে থাকতে দেখলাম। সকালের উজ্জল রোদ তার শরীরে পরশ বুলিয়ে চলেছে। চোখ বন্ধ। ঠোটে তৃপ্তির হাসি। তার গৃহ নেই, এ উন্মুক্ত পথই তার গৃহ। বুকের মধ্যে আচমকা এক অদ্ভুত আলোড়ন ওঠে। ইচ্ছা হয় এই লেবাস খুলে বসে পড়ি তার পাশে। আমাদের চিরচেনা জগতের বেড়ি থেকে বের হয়ে একবারের জন্য হলেও অনুভব করি খোলামেলা ভাবটি।

আমি লোকটিকে দ্রুত পাশ কাটিয়ে যাই। এলিভেটরের সামনে সংক্ষিপ্ত অপেক্ষা। পঁচিশ তলায় অফিস। সংরক্ষিত। জাদুর কার্ডের মন্ত্রবলে দুয়ারের পর দুয়ার উন্মুক্ত হয়, মহারাজের অপেক্ষামান ডেস্ক ও চেয়ারটি তাকে নীরব সম্ভাষণ জানায়। কমপিউটারের মনিটরটির দিকে তাকিয়ে থেকে মুহূর্তের জন্য বিদ্বেষে প্লাবিত হই। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, কি এক ঘানি টেনে চলেছি। কতো কি হওয়ার ইচ্ছা ছিল। সকল জল্পনা কল্পনার পরিসমাপ্তি এখানে। মস্তিস্কে আচমকা সঙ্গীতের মূর্ছনা শুনি - মোরা ধান ভাঙ্গি রে, মোরা ধান ভাঙি রে। আমার ডানে শাশা, রাশিয়া থেকে। বামে মুরালি, ইনডিয়া থেকে। তার ওপাশে বেথ, চায়না থেকে। ম্যানেজারের সঙ্গে ঝগড়া করে দুই পাতার একটি ইমেইলে লোকটির সম্বন্ধে বিস্তর আপত্তিকর কথা লিখে বান্ধবীকে পাঠানোর পরিবর্তে ভুলে বদমাশ ম্যানেজারকেই পাঠিয়েছিল। ভুল আবিষ্কার করার পর দ্বিতীয় আরেকটি ইমেইল পাঠাতে হলো আগের পত্রটি অবজ্ঞা করার অনুরোধ জানিয়ে। সেই সমস্যা তার অল্পে মেটেনি। ম্যানেজারটি শ্বেতাঙ্গ। তার ভাবভঙ্গিতে উন্নাসিকতা প্রকট। তাকে দেখলেই আমার পিত্তি জ্বলতে থাকে। মোরা ধান ভাঙি রে, মোরা ধান ভাঙি রে।

বিতৃষ্ণা নিয়েই কাজে নামি। জীবিকার জন্য কতো কিছু করে মানুষ। আমি ভাগ্যবান। একটি নরম আসনে বসে কিবোর্ডে আঙুল চেপে যাই। কিন্তু হৃদয় তা বোঝে না। দুর্ভাগাদের সঙ্গে কি সর্বক্ষণ তুলনা চলে? সকাল এগারোটার দিকে শাহজাদার ফোন আসে। "হ্যাপি অফিস বাবা!"

তরমুজ জোড়া লাগায়ে দাও

এই কাহিনী অল্প কিছুদিন পূর্বের। একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এলো আমার জীবনে । সংক্ষেপে, পূর্বের কাজটিতে বড় হুজুর, ছোট হুজুর, তাদের মুখ্য চামচা, পাতি চামচা সকলের সাথে বাক-বিতন্ডা, মুখ দেখাদেখি বন্ধ হবার উপক্রম হতে অন্য কাজ দেখা ছাড়া দ্বিতীয় পথ খোলা ছিলো না। সৌভাগ্যবশতঃ দ্রুতই আরেকটি কাজ পেয়ে যাওয়ায় পূর্বের আগ্নেয়গিরি থেকে পরিত্রাণ পেলাম। নতুন কাজটিও টরোন্টো ডাউন টাউনে। বাস্তবে পূর্বের কর্মক্ষেত্র থেকে "গলা বাড়ালেই নজরে পড়ে" অবস্থা। এখনও বাসে ও সাবওয়েতেই যাতায়াত চালিয়ে যাই। অফিস আঠারো তলায়। লাঞ্চের সময় সুযোগ পেলেই নীচে নেমে আসি। নীচতলার সমগ্রটুকুই দোকানপাট ভরপুর। নানান জাতের খাবার দোকান থেকে শুরু করে জুতা সেলাইয়ের দোকানও রয়েছে। আমি সুযোগ পেলেই একটি গ্রোসারীর মধ্যে ঢুকে থরে থরে সাজিয়ে রাখা দৃষ্টিনন্দন ফলমুল, শাকসব্জি পরখ করি। যেকোন ধরনের খাদ্যের সংস্পর্শেই আমার হৃদয় উৎফুল্ল হয়ে উঠে। মাঝে মাঝে যুৎসই মূল্যে কিছু পেয়ে গেলে কিনে ফেলি। এই বিশেষ দিনে দোকানে ঢুকেই দেখলাম বিশাল এক ঝুড়ি ভর্তি থরে থরে সাজানো গোলাকৃতি তরমুজ। তাদের চেকনাই শরীর দেখেই জিহ্বায় উত্তেজনা। বেশ কয়েকজন চৈনিক বৃদ্ধের ভীড় ঠেলে একটি বড়সড় তরমুজ বগলদাবা করে কেটে পড়ছিলাম, ধমক খেয়ে থমকে দাঁড়াতে হলো। চৈনিক বৃদ্ধদের একজন আমার নাকের ডগায় তর্জনি নেড়ে ভয়ানক উচ্চারণে ইংরেজি ও চীনা ভাষার মিশ্রণে যা বললো তার বঙ্গানুবাদ করলে দাঁড়ায় - 'কেমন বুরবক হে তুমি? তরমুজ চেনো না? এটাতো পানসে হবে। রেখে দাও, জলদি রেখে দাও।'

রেখে দেই। তাদের বক্রিম হাসি দেখে নিজেকে বাস্তবিকই অপদার্থ মনে হয়। বললাম, 'কোনটা ভালো?' আবার নাকের ডগায় তর্জনি। 'এই সামান্য ব্যাপার জানো না, কোন দেশের মানুষ তুমি হে? দেখো।' বৃদ্ধ একটি তরমুজ বাম হাতের তালুতে সাবধানে তুলে ভারসাম্য রক্ষা করতে করতে ডান হাতের আঙুল দিয়ে চটাস করে একটি চাটি দেয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় চাটির পর অপদার্থ তরমুজটি ফিরে যায় যথাস্থানে। অন্য একটির শরীরে পড়ে চাটি। পরবর্তি দশ মিনিটে ডজনখানেক তরমুজে তাল তুলে, আঙুলের ডগা টাটিয়ে পরিশেষে সকল বৃদ্ধের সম্মতিক্রমে একটি তরমুজ বাছাই করা গেলো। সিক্স-নাইনটি নাইন (ছয় ডলার নিরানব্বই সেন্টস) দিয়ে সেটি ক্রয় করে বগলদাবা করে অফিসে নিয়ে এলাম। বাসায় ফেরার সময় সঙ্গে নিয়ে যাবো। সাবওয়েতে এই তরমুজ নিয়ে উঠতে দেখলে কিছু রসিক হৃদয়ে রসের সঞ্চার হতে পারে ধারণা করি, কিন্তু সেই ভয়ে ভীত হয়ে স্থিত হবার মানুষ আমি নই।

ফিরতির সময় দেখা হলো আযম ভাইয়ের সাথে। তিনিও একই দালানে অন্য একটি কম্পানীতে কাজ করেন। বয়েসের ফারাক অল্পই। আমাদের মধ্যে যথেষ্ট সখ্যতা রয়েছে। বিশেষ করে তারও মৎস্য ধরার বাতিক থাকায় আমাদের ছুটির দিনগুলিতে দুর-দুরান্তে যাওয়া হয় অসহায় অর্বাচীন মৎস্যদের জীবননাশ করতে। তিনি তরমুজ হাতে আমাকে দেখেই আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে হাসতে লাগলেন। 'করছেন কি ভাই, এইডা কি নিয়া চললেন? মানুষের কাছে তো আর মুখ দেখাইতে পারবেন না। প্যান্ট, শার্ট, জুতা পইরা চলছেন এক তরমুজ মাথায় নিয়া! ছিঃ, ছিঃ। হা হা-হা..... '

আমি আড়চোখে চতুর্দিকে নজর বোলাই। বেশ কিছু ঠোঁটে হাসির ঝিলিক। রূপসী এক তরুণীর মুখে সম্ভাব্য ব্যাঙ্গের হাসি দেখে দুর্বল হৃদয়ে বীনা বেজে উঠলো। 'কি করি বলেন তো আযম ভাই? দেখে লোভ সামলাতে পারলাম না ....।'

আযম ভাইয়ের কাছে সব কিছুরই সমাধান আছে। তিনি অফিসে ব্যাকপ্যাক নিয়ে আসেন। ভেতরে তার ক্ষুদ্র লাঞ্চ বক্স ছাড়া অন্য কিছু থাকে বলে মনে হয় না। তিনি তার ব্যাকপ্যাক নামিয়ে ফেললেন। 'এইটার মধ্যেই ঢুকাইয়া ফ্যালেন। মজবুত আছে। ছিঁড়বো না।

প্রাণে পানি পাই। তার বিশালকায় ব্যাক প্যাকে আমার তরমুজ চমৎকার এঁটে যায়। আমি সেটাকে কিছুক্ষণ হাতে বহন করে বিরক্ত হয়ে পিঠেই ঝুলিয়ে ফেলি। কিং ষ্টেশন থেকে সাবওয়েতে উঠে ব্লর ষ্টেশনে নামি আমরা। এখানে ট্রেন পাল্টাতে হবে। স্বভাবতই অফিস ফেরত যাত্রীদের ভয়ানক ভীড় এই জাংশনটিতে। ট্রেনের বাইরে পা রাখতেই প্রথম যে দৃশ্যটি হৃদয়ে বিশেষ রকম দোলা দিলো তা হচ্ছে পুলিশের উপস্থিতি। মাত্র কয়েকদিন আগেই লন্ডনের সাবওয়েতে ভয়াবহ বোমা হামলা হয়ে গেছে। টরোন্টোতেও মানুষজন বেশ ভীত চকিত। কানাডার ভূমিকা আদতেও ঝুঁকিপূর্ণ না হলেও উত্তেজিত মস্তিষ্কের বুদ্ধি-বিবেচনার উপর আস্থা রাখাটা সহজ নয়। টরোন্টোর কিছু কিছু জনপূর্ণ স্টেশনে পুলিশ মোতায়েন করা হবে বলে শুনেছিলাম। অফিসে যাবার সময় সম্ভবত দূর থেকে তাদের শ্রীবদন দেখেছিলাম। কিন্তু ট্রেন থেকে নেমেই চারজনের একটি দলের একেবারে মুখোমুখি পড়ে যাবো চিন্তাও করিনি। মুহূর্তের মধ্যেই তাদের টানটান শরীর এবং ভীত বিহ্বল নড়াচড়া দেখেই মানস চক্ষে আমার এই নশ্বর জীবনের সকল ভ্রান্তি সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে গেলো। আমার পিঠে বিশাল একটি ব্যাক প্যাক দেখে এই আইনের রক্ষকদের হৃদয়ে অসম্ভব উত্তেজনার সৃষ্টি হলে আশ্চর্য হবার যে কিছু নেই, এই অপ্রীতিকর মুহূর্তেও তা স্বীকার করতে হলো। আযম ভাই সম্ভবত প্রায় একই সময়েই ভুলটি ধরতে পারলেন। তিনি বিড়বিড়িয়ে বললেন, 'খাইছেরে! এক্কেরে সর্বনাশ হইছে। একদম নইড়েন না। গুল্লী মাইরে দিবো।'

আমি তাকে উদ্দেশ্য করে আশ্বস্তকর কিছু বলার আগেই পুলিশ অফিসারদের দলটি আমাদেরকে অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে ধরলো। বিশালকায় শ্বেতাঙ্গ অফিসারটি কাঁপা হাতে পিস্তলের বাঁট চেপে ধরে কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট কাঠিন্য এনে বললো-'দাঁড়াও! একপাও নড়বে না। হাত তোলো।'

আমি হাসিমুখে শ্রাগ করি। 'না, না, তোমরা যা ভাবছো তা নয়'।

আযম ভাই বললেন, 'আবার কথা কন ক্যান? হাত তুলেন। আমার মত এক্কেরে সোজা কইরা।'

আমি তার কথায় কর্ণপাত না করে আবার এই হাস্যকর ভুলটি ভেঙে দেবার প্রচেষ্টা করি। কিন্তু এইবার মুখ খুলবার আগেই একাধিক কণ্ঠের সম্মিলিত হুংকার ভেসে এলো, 'হাত তোলো, জলদি! দু'জনার কেউ নড়বে না।'

কি কেলেংকারি! চারদিকে শত শত মানুষ প্রস্তরীভূত হয়ে গেছে। তাদের ভীত চকিত দৃষ্টি যে আমার ব্যাক প্যাকের উপর তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমি হাসবো না কাঁদবো ঠাহর করতে না পেরে আযম ভাইয়ের অনুসরণে দুই হাত খাড়া গগনমুখী তুলে দিলাম। 'দেখো অফিসার, তোমরা ভুল করছো .....'

এক খর্বাকৃতি কৃষ্ণাঙ্গ পুলিশ অফিসার বাঁজখাই গলায় বললো, 'উত্তেজিত হয়ো না। ধ্বংসাত্মক কিছু করবার কোন প্রয়োজন নেই। এটা কানাডা।'

আমি সহাস্যে বলি, 'তরমুজ! তরমুজ!'

আমার কণ্ঠে কিছু ছিলো নাকি শব্দটির মধ্যেই কোন যাদু আছে, মুহূর্তের মধ্যে চারজনের হাতেই পিস্তল উঠে এলো। এবার আমার হৃৎপিন্ড দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ধড়াক ধড়াক নৃত্য শুরু করলো। আযম ভাই কাতর কণ্ঠে বললেন, 'কি বালা মুসিবতে ফালাইলেন ভাই। পোলা মাইয়ার মুখগুলান লাস্ট টাইমের মতো দেখতে মন চায়।'

তাকে ভীন দেশীয় ভাষায় আলাপ করতে শুনে অফিসারদের ভীতিবোধ দ্বিগুণ হলো। তরুণ অফিসার দু'জনার পায়ের কাঁপাকাপি পরিষ্কার নজরে পড়ছে। বেচারীরা অস্থির দৃষ্টিতে তাকালো বিশালকার শ্বেতাঙ্গ ও ক্ষুদ্রাকৃতি কৃষ্ণাঙ্গ অফিসারের

(ভারতীয় বংশোদ্ভুত বলেই ধারণা হলো) দিকে । অন্যজন সম্ভবত ইস্ট ইউরোপীয়ান। আমার শরীর এবার শীতল হয়ে এলো। ভয়ে দিক বিদিক হয়ে এই ছোড়া দুটি গুলি ছুঁড়তে শুরু না করলেই হয়। আমি কণ্ঠস্বর যথেষ্ট সংযত করে ঠোঁটের মাঝে ঝুলতে থাকা হাসিটাকে সম্পূর্ণভাবে উধাও করে দিয়ে তরমুজের ব্যাপারটা পুনরায় ব্যাখ্যা করতে শুরু করেছিলাম, কিন্তু কে শোনে কার কথা। চারদিকে সন্ত্রস্ত যাত্রীদের হুড়োহুড়ির আওয়াজ চাপিয়ে শ্বেতাঙ্গ অফিসারটি বললো-'ব্যাকপ্যাক খুলে মাটিতে রাখো।'

আমি শ্রাগ করি। যাক, অবশেষে পরিস্থিতি সঠিক পথে এগুচ্ছে। কোনরকমে ব্যাকপ্যাকটা খুলে ভেতরের বস্তুটির অবয়ব এই অপগন্ডগুলিকে দেখাতে পারলে এই যাত্রা ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। আমি ব্যাকপ্যাকে হাত দিতেই চার খানা পিস্তলের নল আমার শরীর বরাবর স্থির হলো। 'আস্তে, খুব আস্তে।' সতর্কবাণী ভেসে এলো। তাদের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করি। খুব ধীরে ধীরে ব্যাকপ্যাকটাকে নামিয়ে রাখি আমার পাদপ্রান্তে। হায়রে তরমুজ! আবার বাঁজখাই কণ্ঠের নির্দেশ এলো, 'পিছিয়ে যাও। খুব সাবধানে। কোন চালাকি নয়।'

চালাকি! এই ঝামেলা থেকে রেহাই পেলে শিন্নী দেবো। আমি এবং আযম ভাই কয়েক পা পিছিয়ে দাঁড়াই। পরিস্থিতি কিঞ্চিৎ সহজ হয়েছে ধারণা করে বলি, 'একটা তরমুজ কিনেছিলাম। সেটাই ব্যাকপ্যাকে। বোমা নয়।'

শব্দ চয়নে ভুল হলো। বিকট এক চীৎকার দিয়ে সমর ভঙ্গিতে ফিরে গেলো অফিসার চারজন। তারা তারস্বরে চীৎকার করতে লাগলো-'নড়বে না। একদম নড়বে না!'

নড়তে আমার বয়েই গেছে। আমার এখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা। আযম ভাইয়ের অবস্থা আমার চেয়েও এক কাঠি মন্দ। এই অযাচিত চীৎকার চেঁচামেচিতে যাত্রীদের মধ্যে আরেকটি হৈ হল্লা উঠলো, ছুটাছুটি শুরু হলো। ঠিক কি কারণে পরিষ্কার নয়, সম্ভবত এতো ছুটাছুটির কারণে যে কম্পনের সৃষ্টি হলো তাতেই ব্যাকপ্যাকটি গোলাকৃতি তরমুজের ভারে গড়াতে শুরু করলো ট্রেন লাইনের দিকে। প্লাটফর্ম ট্রেন লাইন থেকে প্রায় পাঁচ-ছয় ফুট উঁচু হবে। নীচে পড়লে তরমুজটি নির্ঘাত ছাতু হবে। আমি বিনীত কণ্ঠে বললাম, 'পড়ে যাবে তো। ধরবো?'

তারস্বরে চীৎকার, 'নড়বে না। সবাই মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ো। বোম! বোম!'

আমার অসহায় দৃষ্টির সামনে প্লাটফর্ম থেকে সাবলীল গতিতে গড়িয়ে নীচের মাটিতে ধপাস করে আছড়ে পড়লো তরমুজটা। ভেঙ্গে চৌচির হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো। আড়চোখে তাকিয়ে যা দেখলাম তাতে হৃদয়ে ঝড় উঠলো। চৈনিক বৃদ্ধেরা ঠিকই বলেছিলো। তরমুজ বাছাইয়ে তাদের ভুল হয়নি। রক্তলাল শাঁস দেখেই বোঝা গেলো ফলটি নিঃসন্দেহে স্বাদের ছিলো। আমি অগ্নি দৃষ্টি মেলে পুলিশ চারজনকে ভস্ম করতে লাগলাম। তারা কিঞ্চিৎ লজ্জিত হাসি হেসে পরস্পরের সাথে চোখাচোখি করে। আমি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললাম, 'তখনই বলেছিলাম। কোন কথাই শুনলে না তোমরা। এখন দাও আমার তরমুজ জোড়া লাগিয়ে। Put my melon together.'

আযম ভাই চোখ বড় বড় করে আমাকে দেখছেন। 'কি করতাছেন ভাই! Melon, melon কইরেন না, চলেন ফুটি।' আমি তাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করি। আমার ক্রোধ বেশী নয় বলেই আমার ধারণা। কিন্তু এই জাতীয় অবিবেচনার কারণে আমার সাধের তরমুজের করুণ দশা দর্শনে মস্তিষ্কের নিভৃতে নিশ্চয় কোন এক অপ্রতিরোধ্য ঝংকারের সৃষ্টি হয়ে থাকবে। আমি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে দ্বিতীয়বারের মতো বললাম, 'Put my melon together. তরমুজ জোড়া লাগিয়ে দাও, এক্ষুনি!'

শ্বেতাঙ্গ অফিসারটি হতভম্ব কণ্ঠে বললো, 'ভাঙ্গা তরমুজ কেমন করে জোড়া লাগায়? (How do you put a broken melon together?)'

আমি গলার রগ ফুলিয়ে বলি- 'জোড়া লাগাতে না পারলে ভাঙলা ক্যান? '

তারা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো। আমি বেশ কয়েকটি আপত্তিকর মন্তব্য করে নিজ পথে রওনা দেই। আযম ভাই দৌড়ে আমার সঙ্গ নিলেন। 'বেশ কইছেন ভাই। ইরাকে কি করলো ওরা! সোনার দ্যাশডা ভাইঙ্গা দিলো। লন্ডনে বোমা পড়বো না কি আমার মাথায় পড়বো? হালায় বেলেয়ার (Blair)! তোরে কই নাই আগে, ইরাকে যাইস না। আমাগো ভাই-বোনেরাই তো মরতাছে। ভালো কইরা দুইখান কথা শুনাইছেন।'

আমি তিক্ত কণ্ঠে সত্য প্রকাশ করি, 'আরে রাখেন আপনার ইরাক, লন্ডন। আমার সিক্স নাইনটি নাইন (ছয় ডলার নিরানব্বই পয়সা) মাটিতে গেলো, আর আপনি ভাবতাছেন অন্যের কথা!'

আযম ভাই ভয়ানক আহত কণ্ঠে বললেন- 'ছিঃ ছিঃ, এইডা ক্যামন কথা কইলেন ভাই? হাজার হাজার মানুষ মরলো। এইডা বড় হইলো না আপনার তরমুজ বড় হইলো? '

মেজাজে ঝংকার উঠলে স্বধর্মীয় অনেকের মতই আমারও মস্তিষ্ক গো-মলে পরিণত হয়। আমি সোজাসাপটা জানিয়ে দেই, 'অতো বড় বড় কথায় আমার দরকার নাই। সারা জীবন তো চায়ের কাপে ঝড় তুলে গেলেন। কি এমন দুনিয়া উদ্ধার করেছেন?'

তিনি রাগে কাঁপতে কাঁপতে মানিব্যাগ বের করে আমার হাতে সাতখানা ডলার ধরিয়ে দিলেন। 'লন টাকা। পুরা সাত ডলার। কিন্তু কথাবার্তা একটু সামলাইয়া কইয়েন। আর মাছ ধরনের সময় আমারে ফোন দিয়েন না।'

আমি নির্বিকারে টাকাগুলি পকেটে ঢুকিয়ে বলি, "এক পয়সা নিয়া যান।"

তিনি আমাকে একটি অগ্নি দৃষ্টি দিয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে যাবার আগে বললেন, 'রাইখ্যা দেন। পরকালে কামে দিবো।'

তার শেষোক্ত উক্তিটি আমার এন্টেনার উপর দিয়ে চলে গেলেও ভুল বুঝতে দেরী হয় না। সেই রাতেই আমি তার বাসায় গিয়ে তার টাকা ফেরত দেই। পরিবর্তে তিনি পরবর্তি ছুটির দিনে আমার সাথে মাছ ধরতে যেতে সম্মত হন।

CN Tower উচ্চ করি শির

টরোন্টোতে বেড়াতে এসে যে সি-এন-টাওয়ার (CN Tower) না দেখে ফিরে যায় তার জীবন যদি আট আনা মিছে হয়, এই শহরে ছয় বছর বাস করে যারা এই বিশ্ববিখ্যাত গগনচুম্বী কাঠামোর নাকের ডগায় ভ্রমণ করেনি তাদের জীবন বুঝি ষোল আনাই মিছে। আমরা হলাম সেই দলে। যাবো, যাচ্ছি, গেলামতো করতে করতে কিভাবে যে এতগুলো বছর পেরিয়ে গেলো।

যাই হোক, অধিকাংশ টরোন্টোবাসীর মতো আমাদেরও শহর ঘোরা হয় বিদেশী অতিথি এলে। তাদেরকে সঙ্গ দিতে গিয়ে নিজের পরিচিত শহরটাও একটু খুটিয়ে দেখা হয়। রবীন্দ্রনাথ ভুল বলেননি - দুনিয়া ঘোরা হলো কিন্তু ঘরের পাশের ধানের ডগায় শিশির বিন্দুটাই বাদ থেকে গেলো। উপমাটা ঠিক যুতসই হলো না কারণ CN Tower কে কোন অবস্থাতেই শিশির বিন্দু বলে চালানো সম্ভব নয়। টরোন্টোর সীমান্তের ধারে কাছে এলেও এই কাঠামো যে কারো নজরে পড়বে। নিকটবর্তী কোন সুউচ্চ দালানের আড়ালে না পড়লে তাকে না দেখাটা অসম্ভব।

লন্ডন (ইংল্যান্ড) থেকে আমার দুঃসম্পর্কের চাচা এবং চাচী বেড়াতে আসায় তাদের অনুরোধে এক সুপ্রভাতে আমরাও তাদের পিছু পিছু টরোন্টো ডাউনটাউন উপলক্ষ্যে রওনা দেই। স্বল্প কিছুদিন আগে স্কারবোরোর এপার্টমেন্ট ছেড়ে আমরা নিকটবর্তী শহর এজাক্সে বাড়ী কিনেছি। এখান থেকে ট্রেনে চেপে সরাসরি টরোন্টোর কেন্দ্রে চলে যাওয়া যায়। গাড়ীতে গেলে রাস্তার গোলকধাঁধাঁতো আছেই, পার্কিংও সমস্যা।

চাচা - আব্দুল আজীজ, ব্যবসায়ী মানুষ কিন্তু তার সৌন্দর্যবোধ শিল্পীর মতো। লেক ওন্টারিওর পাশ দিয়ে ট্রেন যখন সবেগে এগিয়ে চলেছে তিনি শান্ত, সমাহিত পানির উপরে ঝিকিয়ে ওঠা সূর্যের ঝিকিমিকি দেখে এতই মুগ্ধ হয়ে গেলেন যে সবার সামনেই স্ত্রীকে লক্ষ্য করে গেয়ে উঠলেন - 'রূপ দেখে তোর মজলাম আমি, ও সুন্দরী।'

চাচী - আসমা ছদ্ম কোপে ধমকে উঠলেন। 'থামো তো। নিজে নিজে গান বানায়। ছাই ভস্ম!'

আমরা সবাই তাতে কলকলিয়ে হেসে উঠি। জাকির বাংলা যথেষ্ট ভালো নয়। সে কৌতুহলী কণ্ঠে বললো,

'হাসির কি হলো? হাসো কেন?'

এবার চাচা-চাচী তাকে লক্ষ্য করে হেসে উঠলেন। 'আমাদের গুলোরও একই অবস্থা।' চাচী বললেন। 'বাংলা বলে বিদেশীদের মতো।' তাদের তিনটি ছেলে মেয়ে, সবাই ইউনিভার্সিটিতে যায়। কেউ আসেনি এই সফরে।

আমার মেয়ে ফার, যে মাত্র তিনে পড়েছে, কিছু না বুঝেই সবার সাথে টেনে টেনে হাসলো। তার এই অদ্ভুত ছদ্ম হাসি দেখে আরেক ঝলক হাসি বড়দের। চমৎকার রোদ ঝলমল গ্রীষ্মের দিন। বোঝা গেলো আমাদের সবারই প্রফুল্ল মন।

ইউনিয়ন ষ্টেশনে নেমে স্কাইওয়াক (Skywalk) ধরে আমরা টাওয়ার অভিমুখে হাঁটতে থাকি। এই প্রশস্ত পায়ে চলা পথটি সম্পূর্ণ ঢাকা এবং শহরের কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় তার যাত্রা। গ্রীষ্মে শহরের ফুটপথ দিয়ে হাঁটতে মন্দ লাগে না কিন্তু শীতের সময় ঠান্ডা এবং তুষার থেকে নিস্তার পেতে হলে এই অবগুন্ঠিত পথই ভরসা। আমরা স্কাইওয়াক (Skywalk) নিয়েছি কারণ চাচা-চাচী রোদ পছন্দ করেন না।

পনেরো বিশ মিনিটের হাঁটা শেষে আমরা সুউচ্চ টাওয়ারের পাদপ্রান্তে পৌঁছলাম। মুহূর্ত পরেই যে দৃশ্য দেখলাম তাতে আমার চক্ষু চড়ক গাছে উঠলো, হৃদয় গেলো ধরনীতলে। বাস্তবে দৈর্ঘ্য কতখানি হবে জানিনা কিন্তু আমার বিরস নয়নে মনে হল কম করে হলেও এক কিলোমিটার লম্বা লাইন লেগেছে টাওয়ারের টিকিট কাউন্টারে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লাম। লম্বা লাইন দেখলেই আমার সর্বশরীরে চুলকানি শুরু হয়। কিন্তু উপায় নেই। চাচা-চাচী আগেই বলে রেখেছেন দুনিয়া এস্‌পার ওস্‌পার হয়ে গেলেও তারা উপরে উঠবেন। সুতরাং লাইনে দাঁড়ানো ছাড়া গতি নেই। টাওয়ারের নীচে খাবারের দোকানসহ সুভেনিরের দোকানপাট আছে। বসার সুন্দর জায়গা। শিলি চাচা-চাচী এবং সন্তানদের নিয়ে হাসি মুখে সেখানে গিয়ে আস্তানা গাড়লো। এই হতভাগা রয়ে গেলো টিকটিকির অন্তহীন লেজের ডগায়। ও পাষানী--- ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঘন্টাখানেক লাইনে দাঁড়িয়ে গলদঘর্ম হয়ে, অল্প বিস্তর গুতা খেয়ে এবং দু' একটি ভদ্রোচিত গালি দিয়ে শেষ তক টিকিট কাটা গেলো। টাওয়ারে বেশ কয়েক ধরনের টিকিটের ব্যবস্থা। মুল আকর্ষণ হচ্ছে অবজারভেসন ডেক (Observation deck), কাঁচের মেঝে (glass floor), স্কাই পড (sky pod), ঘূর্ণমান রেস্টুরেন্ট (যেটা আবার নিজ অক্ষের চারদিকে চক্কর দেয়) এবং হিমালামাজন - একটি মোসন থিয়েটার রাইড (motion theatre ride)। চাচা-চাচীর প্রধান আগ্রহ কাঁচের মেঝেটা দেখা এবং ঘূর্ণমান রেস্টুরেন্টে খাওয়া। সুতরাং সেভাবেই টিকিট কাটলাম। আরাম কেদারা থেকে বাকীদেরকে টেনে তুলে ছুটলাম এলিভেটরের লম্বা লাইনের ইতি হতে। অনেকগুলি এলিভেটর আছে। আশা করছি এখানে অপেক্ষাটা কম হবে।

প্রায় বিশ পঁচিশ মিনিট অপেক্ষা করতে হলো। ইত্যবসরে ব্রোসিয়ারে দ্রুত নজর দুলিয়ে বিশ্ব বিখ্যাত 'সিএন টাওয়ার' এর উপর যথেষ্ট জ্ঞান আহরণ করা গেল। ৭০ এর দশকে টরোন্টোতে প্রচুর দালান কোঠা গগণচুম্বী হয়ে ওঠায় রেডিও টেলিভিশনের সিগনাল সম্প্রসারণে সমস্যা দেখা দেয়। সেই সুবাদেই এই টাওয়ারের গোড়াপত্তন। ১৯৭৩ সালে কাজ শুরু হয়। শেষ হয় ১৯৭৫ এ। এন্টেনাসহ দালানটির উচ্চতা ১৮১৫ ফিট ৫ ইঞ্চি। এক সময় পৃথিবীর উচ্চতম দালান হিসাবে বিবেচিত হলেও সেই সম্মান এখন দুবাইয়ে নির্মিত বার্জ দুবাইয়ের। কিন্তু সেটা ব্যতিরেকেও অন্যান্য কয়েকটি বিশ্ব রেকর্ড এখনও ধারণ করছে এই টাওয়ার: দীর্ঘতম ধাতব সিড়ি - ২৫৭৯ টি ধাপ; উচ্চতম কাঁচের মেঝে - ১১২২ ফুট, উচ্চতম ওয়াইন সেলার (wine celler) - ১১৫১ ফুট, উচ্চতম অবজারভেসন গ্যালারি (observation gallery) - ১৪৬৫ ফুট। মন্দ নয়। নিজ শহরের এমন বিশ্বজয়ী প্রতাপ দেখে নিজের অজান্তেই বুকটা গর্বে কিঞ্চিৎ ফুলে উঠলো।

এলিভেটরে অবশেষে যখন পদার্পণ করার ভাগ্য হলো তখন আমার শরীর ঠান্ডা হয়ে এলো। টাওয়ারের দেয়াল ঘেষে লেগে থাকা প্রশস্ত এলিভেটরের এক পাশ সম্পূর্ণ কাঁচের। যার অর্থ তীব্র গতিতে যখন সেটি উর্দ্ধ মুখে যাত্রা করবে আমাদের দৃষ্টির সামনে নীচের পৃথিবী ক্ষুদ্র হয়ে যাবে। উচ্চতার প্রশ্ন যখন আসে তখন আমার চিত্ত হয়ে ওঠে দুর্বল। চারিদিকে ঢাকা এলিভেটরের মধ্যে নিশ্চিন্ত মনে দাঁড়িয়ে থাকা এক কথা আর স্বচ্ছ দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে সাই করে উঠে যাচ্ছি সেটা দেখা সম্পূর্ণ অন্য কথা। আমি যতখানি সম্ভব পশ্চাতের দেয়াল ঘেষে দাঁড়ালাম। আমার দূর্বলতার কথা শিলি জানে। সে মুচকি মুচকি হাসছে। তার আবার উচ্চতা ভীতি বলতে কিছু নেই। ছেলেমেয়ে দুটি ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকাচ্ছে। ভয় পাবে কি পাবে না বোঝার চেষ্টা করছে। চাচা চাচী বেশ মজা পাচ্ছেন। বোঝা গেলো এই ধরনের এলিভেটর এটাই তাদের প্রথম নয়।

একরকম চোখের নিমেষেই ১১৪ তলায় লুক আউট লেভেল (Look out level)-এ এসে থামলো এলিভেটর। একটু আগের টরোন্টো শহর ঝট করেই খেলনার শহরে পরিণত হয়েছে। চিকণ সুতার মতো রাস্তা-ঘাট, কালচে আবছায়ার মতো দালান কোঠার সারি। এখান থেকে সম্পূর্ণ শহরটার ৩৬০° দৃশ্য দেখা যায়। দক্ষিণে লেক ওন্টারিওর আদিগন্ত নীল

জল, তার তীর বেয়ে বহমান নদীর মতো গার্ডিনার এক্সপ্রেসওয়ে চলে গেছে পশ্চিমে, উত্তরে বিশাল এক টুপির মতো দেখতে থমসন হল। সারি সারি চিকণ রাস্তার ছক পূর্ব পশ্চিম চিরে ছুটে গেছে ওন্টারিওর ব্যস্ততম সড়ক ৪০১ এ - আরেকটি এক্সপ্রেসওয়ে। কোথাও ঘন, কোথাও হালকা বসতির মাঝ দিয়ে ছুটে গেছে ৪০১, আড়াআড়ি ছেদ করেছে আরো দু'টি এক্সপ্রেসওয়েকে - ৪০০ ও ৪০৪। চারদিকে শহরের ব্যস্ততা থাকলেও গাছপালা আর ছোট ছোট হ্রদে সমস্ত এলাকাটাকে যেন প্রাকৃতিক স্বপ্নপুরীর মতো লাগে। আমরা নয়ন ভরে টরোন্টোকে দেখে নিলাম।

পরবর্তী গন্তব্য ঠিক নীচতলার গ্লাস ফ্লোর (glass floor)। চাচা চাচী আগেই মনস্থির করে এসেছেন কাঁচের মেঝেতে দাঁড়িয়ে তারা একটা ছবি তুলবেন। এখানে নেমে মেঝেটাকে দেখার পর আমার শরীর হীম হয়ে এলো দ্বিতীয়বারের মত।

কাঁচের মেঝেটির আকার ২৫৬ বর্গফুট, ৪২ ইঞ্চি বাই ৫০ ইঞ্চি-র ছোট ছোট কাঁচের প্যানেল দিয়ে তৈরী। প্রতিটি প্যানেল ২.৫ ইঞ্চি চওড়া, যার মধ্যে ১ ইঞ্চি বাতাসের স্তর আছে ইনসুলেশনের জন্য। প্রচন্ড মজবুত। চৌদ্দটা বিশাল দেহী জলহস্তিকে দিব্যি বুকে ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে। কিন্তু আমার আছে এক্রোফোবিয়া - উচ্চতাভীতি। আমি চোখের কোণা দিয়ে এক পলক তাকিয়েই দেয়ালে সেঁটে গেলাম। এক হাজার ফুট নীচের দৃশ্য নয়ন ভরে দেখার মতো বুকের পাটা আমার নেই। সৌভাগ্যই হোক আর দূর্ভাগ্যই হোক আমার মেয়েটির দেখলাম তার মায়ের মতই উচ্চতা নিয়ে কোন সমস্যা নেই। তারা হাসি মুখে দিব্যি হিলে পটাস পটাস শব্দ তুলে কাঁচের প্যানেলের উপর দিয়ে হেঁটে মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে আকর্ণ বিস্তৃত হাসি হাসতে হাসতে একবার নীচে আরেকবার আমাকে দেখতে লাগলো। জাকি বার দুয়েক সাহস করে যাবার ব্যর্থ প্রয়াস করে আমার শরীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গেলো।

আমি তাকে অস্পষ্ট কণ্ঠে ধমক দিলাম, 'তুই এখানে কি করছিস, যা।'

সে রক্তশূন্য মুখে বিজ্ঞের মতো বললো, 'জেনেটিক্স। আমারও উঁচু জায়গা পছন্দ না।'

আমি মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকলাম। আজকাল কাউকেই ঝাড়ি দিয়ে শান্তি নেই। আট বছরের বালকও জেনেটিক্সের জ্ঞান দিচ্ছে।

চাচা চাচী কাঁচের প্রান্তে দাঁড়িয়ে এই যাই- এই থাকি করলেন বেশ কতক্ষণ। চাচীর দেখা গেলো ভয় অপেক্ষাকৃত কম। তিনি শেষ পর্যন্ত মনস্থির করে শিলি ও ফার এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে একরকম পা টিপে টিপে কাঁচের উপর হাঁটতে লাগলেন। তার কান্ড দেখে হাসি থামাতে পারলাম না।

চাচী কটমট করে তাকালেন। ' খুব যে হাসছো। নিজে তো টিকটিকির মতো দেয়ালের সাথে লেপটে আছো।'

"আমার কেস আলাদা। আপনি যেভাবে হাঁটছেন মনে হচ্ছে এই বুঝি সব ভেঙ্গে পড়লো।"

চাচী থমকে গিয়ে নীচের দিকে তাকালেন সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে, "বাজে কথা বলো না। ভীতুর ডিম।" চাচাকে লক্ষ্য করে, "এই এখনো ওখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন? ঐ ভীতুটাকে ক্যামেরাটা দিয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়াও, একটা ছবি তুলবো।"

চাচা আমার হাতে ক্যামেরাটা গুজে দিয়ে কচ্ছপের মতো এগুতে লাগলেন। আমাকে হা হা করে হাসিতে ফেটে পড়তে দেখে তার আঁতে ঘা লাগলো।

"তুমি এখনও আগের মতই বেয়াদপ আছো।"

শিলি লুফে নিলো, "বলেন কি? ও খুব বেয়াদপ ছিলো?"

"দুচোখের বিষ। আমার টাক নিয়ে বিশাল এক কবিতা লিখে দেয়ালে টানিয়ে ছিলো। চিন্তা করতে পারো।"

"রমনা পার্কে কি দেখেছিলেন সেটা তো বাসায় বলবার কোন দরকার ছিলোনা।" আমি ইতিহাস ঘাঁটি।

"না বলবো না। মেয়েদের সাথে ফস্টি নষ্টি করবে.... "

"কি? কি? ।" শিলির চোখ গোল হয়ে উঠেছে। "রমনা পার্কে কি করছিলো? "

আমি হাতজোড় করি। চাচা জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে বললেন, "সে সব কবেকার কথা, সব মনেও নেই। ঠাট্টা করছিলাম। বেয়াদপটাকে যদি আবার হাসতে শুনি তখন হয়তো মনেও পড়ে যেতে পারে।"

"না না ঠাট্টা নয় ", শিলি কপাল কুঁচকে বললো। "রমনা পার্কে ফষ্টি নষ্টি করতো?"

আমি ক্যামেরা বাগিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। রমনায় ফষ্টি নষ্টি করবার কপাল নিয়ে কি জন্মেছিলাম। তিন সহপাঠিনীকে নিয়ে শটকাট মারবার সময় হঠাৎ এই চাচার চোখে পড়ে যাই। কিছু একটা নিয়ে হৈ হল্লা হচ্ছিলো, কোন এক সহপাঠিনী হয়তো একটু ঢলে পড়েছিলো - ব্যস, তাই নিয়ে তুমুল কান্ড হয়ে যায়।

আজীজ চাচা তার কচ্ছপ যাত্রায় ইতি টেনে চাচীর পাশ ঘেঁসে দাঁড়ালেন। আমি দ্রুত বার কতক ক্যামেরার শার্টার টিপলাম। শিলি কটমট করে তাকিয়ে আছে। ফার ছবি তোলার পাগল। সে নানান ধরনের পোজ দিতে দিতে চিৎকার করছে, ' আমার ছবি তোল, প্লিজ। '

সেখান থেকে বেরিয়ে আরেকটি এলিভেটরে চড়ে স্কাইপড (Skypod) এ এলাম আমরা। ১৪৬৫ ফুট উঁচুতে অবস্থিত এই স্তরটি আকারে সাত তলা একটি দালানের মতো। 'সিএন টাওয়ার' CN Tower এর মার্কা মারা চাকতি আকারের অবয়বগুলি এই স্তরেই অবস্থিত। এখানে রয়েছে দু'টি অবজারভেসন ডেক (observation deck), ঘূর্ণমান রেস্টুরেন্ট (যেটি ৭২ মিনিটে নিজ অক্ষের চারদিকে একবার ঘুরে), এবং বেশ কিছু যান্ত্রিক এলাকা যেখানে টাওয়ারের মূল কার্যক্রম ট্রান্সমিশন ব্রডকাস্ট সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রসমগ্র অবস্থিত। এক কথায় স্কাইপড (Skypod) হচ্ছে সম্পূর্ণ টাওয়ারটির - একটু অলংকরণ করে বলা যায় - মুকুট।

রেস্টুরেন্টে ঢুকবার ইচ্ছা আমার কিংবা শিলির ছিলো না। বেশ সৌখিন রেস্টুরেন্ট, হাল্কা পকেট নিয়ে দুঃসাহস না দেখানই ভালো। ভ্যাঙ্কুভারে আমরা দু'জন একবার সেখানকার ঘুর্ণমান রেস্টুরেন্টে পদার্পণ করেছিলাম। চমৎকার পরিবেশনা, অপূর্ব দৃশ্য, নিদারুণ অভিজ্ঞতা, স্বল্প খাদ্য, দুর্দান্ত মূল্য। এখানেও তার অন্যথা নয়। তবে এই অভিনব অভিজ্ঞতার জন্য সামান্য মূল্য দেয়াটা একেবারে অবিবেচকতা নয়। ন্যুনতম পঞ্চাশ ডলারে টরোন্টোর পরিবর্তনশীল দৃশ্য দেখতে দেখতে নরম আলোয় খাওয়াটা টুরিষ্টদের কাছে বাঞ্চনীয় মনে হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। চাচা চাচী আমাদেরকে খুব সাধাসাধি করলেন কিন্তু আমরা নানান অজুহাত দেখিয়ে বিদায় নিলাম। তারা দু'জন রেস্টুরেন্টে ঢুকে গেলেন। কথা হলো আমরা বাসায় ফিরে যাবো, তারা পরে ট্যাক্সিতে চলে যাবেন। ফিরবার আগে আমরা অবজারভেসন ডেক (observation deck) এ একটা হাজিরা দিয়ে গেলাম। ১৪৬৫ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই অবজারভেসন ডেকটি পৃথিবীর সবচেয়ে উচ্চতম বলে পরিগণিত। আমরা ডেকের চারদিকে ঘুরে ঘুরে টরোন্টোকে আরেক নজর দেখে নিলাম। পরিষ্কার আকাশ থাকলে এখান থেকে নাকি ১৬০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত নায়েগ্রা জলপ্রপাতও দেখা যায়। আজ অবশ্য দেখা গেলো না।

ফিরতি পথে ট্রেনের ঝাঁকুনিতে বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়লো। তাদের মা দীর্ঘক্ষণ নীরব। কারণটা বুঝতে বাকী নেই। তবুও ভনিতা করে বললাম, "এতো চুপচাপ কেন? অন্য সময় তো কথার ফুটানীতে টেকা দায়।" খোঁচাটা ইচ্ছে করেই দেয়া। নীরবতা ভাঙ্গার মোক্ষম অস্ত্র।

কুঞ্চিৎ কপাল, বিরক্ত মুখ, ' ছিঃ ছিঃ। আগে জানলে.... '

সাধারণ জ্ঞান থেকে জানি হাসাটা হবে ভয়াবহ ভুল। কথা বলবার সাহসও হলো না। জন সমক্ষে বেইজ্জতি হবার কোন প্রয়োজন দেখি না। তাছাড়া স্ত্রীর কাছে বিবাহপূর্ব জীবনের একটা রঙিন চিত্র অংকিত হলে তাতে মন্দের চেয়ে ভালোই বেশী। তার জানা থাকা ভালো আমার কদর বিবাহ পূর্ব জীবনে যথেষ্টই ছিলো। সি-এন-টাওয়ার (CN Tower) দেখতে যাওয়াটা নিতান্ত বৃথা গেল না।

পরোটা, সাধের পরোটা

দেশে থাকতে মায়ের হাতের পরোটার চেয়ে সুস্বাদু খাবার আর বোধহয় কিছু ছিলো না। অন্যদের কথা বলতে পারবো না কিন্তু যেদিন সকালে উঠে দেখতাম মায়ের মন ভালো এবং তিনি বেলন-পিঁড়ি নিয়ে যত্ন সহকারে পরোটা বেলছেন সেদিন আমার সমস্ত দিনটাই যেন গুনগুনিয়ে গান গেয়ে উঠতো। পরোটা এবং কুচি কুচি করে ভাজা আলু। 'তেল চুপচুপে' আলু ভাজি। সেই স্বাদ যেন আজও জিহ্বার সর্বাগ্রে লেগে আছে।

বিদেশ বিভুঁইয়ে পাড়ি দেবার পর বেশ কয়েকটি বছর উচ্চ শিক্ষার পাটাতনে বলি হতে হতে পরোটা তো দূরে থাক দুই পয়সার পাউরুটি জোগাড় করতেও মাঝে মাঝে হিমসিম খেতে হয়েছে। কিন্তু সেই কঠিন বছরগুলোর মধ্যেই আলোর প্রদীপ হয়ে এলেন এক বর্ষীয়ান ভারতীয়। আমাদের দুই বেডরুমের এপার্টমেন্টের তৃতীয় রুমমেট নিরামিষাশী এই ছোটখাটো ভারতীয় ভদ্রলোকটির নাম ছিলো তিলাকপ ভি. মুর্তি, সংক্ষেপে মুর্তি। আমরা ডাকতাম মুর্তি দা। অচিরেই জানতে পারলাম তিনি যে শুধু গণিতেই মহাপণ্ডিত তাই নয়, পরোটা প্রস্তুত এবং আলু ভাজায় তার ব্যুৎপত্তি কোন মায়ের চেয়েই কোন অংশে কম নয়। আহা, সে একদিন গেছে! পৃথিবীর অন্য মাথায় বসে আবার সুস্বাদু হাতে বেলা পরোটা এবং তেল চুপচুপে ভয়াবহরকম অস্বাস্থ্যকর আলু ভাজি - জিভে এখনই লোল পড়তে শুরু করেছে। যাইহোক, সেই প্রেম কাহিনী বেশিদিন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। মাস দুয়েক বাদেই যখন জামা-কাপড় সব টাইট হতে শুরু করলো এবং শরীরে বিশেষ রকম চেকনাই দেখা দিলো তখনই সবার টনক নড়লো। আমাদের ক্ষীণ বপু ওজন মাপার যন্ত্রটার উপর দাঁড়িয়ে তড়াক করে লাফিয়ে নেমে তওবা কেটে পরোটায় ইস্তফা দিয়েছিলাম। দুই শ হতে আঙ্গুল বাকি ছিলো। শ্রীকান্তের শুকনো কাঠে ফুল ধরে যাবার দশা।

সেই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন গত হয়েছে বহু বছর। ঘরনী হয়েছে, পুত্র কন্যা হয়েছে, নানান ঘাটের পানি খেয়ে, স্কারবোরোর সুউচ্চ এপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সের পিছুটান ফেলে নিকটবর্তী এজাক্সে এসে উঠে কিঞ্চিত সুস্থির হয়ে বসেছি। এই দেশে যারা থাকেন শুধু তারাই নন, বাংলাদেশের মানুষেরাও ভালোমতই অবগত যে এখানে গৃহকর্মে সাহায্য করবার মতো মানুষ পাওয়া প্রায় অসম্ভবই। ফলে অধিকাংশ মহিলাদেরকেই ঘর ঝাড়ু দেয়া থেকে শুরু করে রান্না করা, কাপড় ধোয়া, বাথরুম পরিষ্কার করা সহ ঘরের তাবৎ কাজই করতে হয়। কিছু গৃহকর্তারা শুনেছি কর্ত্রীদের ফাই ফরমায়েশ খেটে থাকেন। আমার শরীরে আলসেমি ব্যতিরেকে অন্য কোন অস্থি না থাকায় আমাকে দিয়ে এক গ্লাস পানি আনাতেও দশবার বলতে হয় বিধায় গৃহকর্মের তুচ্ছ ব্যাপারে অর্ধাঙ্গিনী আমাকে বহু আগেই বিরক্ত করা বন্ধ করে দিয়েছেন। মন্দ কথা উঠতে বসতে শুনতে হয় কিন্তু কথায় কি আসে যায়। দু'দিন গায়ে ফোটে, তৃতীয় দিনে সয়ে যায়, চতুর্থ দিনে মধু মনে হয়।

সমস্যা একটিই। হাতে বেলা পরোটা খাবার আগ্রহ ষোল আনা থাকলেও সেই প্রসঙ্গ তুলবার সাহস এই শর্মার নেই। বাজারে প্যাকেটজাত পরোটা অবশ্য পাওয়া যায়, ফ্রোজেন। ভেজে খেতে মন্দ লাগে না, সমস্যার মধ্যে তেলের পরিমাণ থাকে অসম্ভব বেশী। এই মাঝ বয়েসে এসে আবার দু'শ-পুরতে-এক-আঙ্গুল পরিস্থিতিতে পড়তে চাই না। সুতরাং কালে ভদ্রেই এই

বস্তুটির এই গৃহে পদার্পণ হয় । ছেলেমেয়েরা অবশ্য পছন্দ করে । তাদের জন্যেই মাঝে মাঝে আনা হয় । মুর্তিদার বিশ্ববিখ্যাত 'তেল চুপচুপে খাবো পেট পুরে' আলু ভাজির রেসিপি মনে থাকায় কয়েকদিন বানিয়ে জাকি এবং ফারকে খাইয়ে বেশ একটা হৈ চৈ ফেলে দিয়েছি । দুই - কাঠি যত ইচ্ছা খাবে, সমস্যার কিছু দেখি না ।

টরোন্টোতে যারা বেশ কিছুদিন ধরে থাকেন তারা জানেন এখানে এপার্টমেণ্টে বসবাসকারী অনেক মহিলারা হাতে বানানো পরোটা, পুরি এবং সিঙ্গাড়া বিক্রী করে । এইগুলি বাসায় নিয়ে গিয়ে ফ্রিজে রেখে দিতে হয়, পরে প্রয়োজন মতো বের করে তেলে ভেজে নিলে খুব অল্প সময়ে মুখরোচক খাবার হয়ে যায় । যে কোন কারণেই হোক এই সর্বজনবিদিত তথ্যটি জানতে আমাদের কয়েকটা বছর কেটে যায় । যখন জানতে পারলাম ততদিনে আমরা এজাক্সের বাড়ীতে এসে উঠেছি । ফলে পরোটা আনতে হলে আমাকে ঘন্টাখানেক পথ ঠেঙ্গিয়ে স্কারবোরোর বিখ্যাত বাঙ্গালীপাড়া ড্যানফোর্থ এভিনিউয়ের পার্শ্ববর্তী এলাকায় যেতে হয় । শুধুমাত্র তারাই কেন এই চুটকী ব্যবসাটা করেন সেটার পেছনেও সামান্য রহস্য আছে । এখানে প্রায় সব এপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সেই ভাড়ার সাথে ইলেকট্রিসিটির খরচ যুক্ত থাকে । ফলে যত ইচ্ছা রান্না করলেও খরচ বেশি হবার কোন সম্ভাবনা নেই । নিজস্ব বাড়ীতে উঠে গেলেই সেই ছবি একেবারেই পাল্টে যায় । তখন ইলেকট্রিসিটি, গ্যাসের খরচ আলাদা গুনতে হয় । পরোটা বেচে যে লাভ হয় তাতে অতিরিক্ত খরচ তুলতেও কষ্ট হয় । তাছাড়া নিজস্ব বাড়ীতে উঠার পর সকলেরই মায়া মহব্বত থাকে বেশি । ঝুট ঝামেলা যত কম করা যায় ততই ভালো ।

বন্ধু বান্ধবদের সূত্র ধরে বেশ কয়েকজন ভদ্রমহিলার খোঁজ পাওয়া গেলো যারা হাতে বানানো পরোটা বিক্রি করেন । বাজারের চেয়ে এইগুলি অনেক স্বাস্থ্যকর । তেল এবং অন্যান্য অস্বাস্থ্যকর উপাদানগুলো ন্যূনতম ব্যবহার করা হয় । বহু বাংলাদেশীই একসাথে কয়েক ডজন করে কিনে গুদামজাত করে থাকেন । বিশেষ করে বাসায় মেহমান এলে এদের চেয়ে উপকারী বন্ধু আর বুঝি কেউ নেই ।

শীত উঁকি দিচ্ছে দিচ্ছে, ঠিক এমন সময় আমার আমেরিকাবাসী বোন টরোন্টোতে বেড়াতে আসার আগ্রহ প্রকাশ করলো । তাদের আগমন সবসময়ই ভয়াবহ রকম উত্তেজনার ব্যাপার হয়ে ওঠে এই বাসায়-প্রধানত বাচ্চাদের কারণে । তাদের চার বছরের পুত্রসন্তান এবং আমাদের দুটিতে মিলে মুহূর্তের মধ্যে মাছের বাজার বসিয়ে দেয় । তাদের হৈ-চৈ, ঝগড়াঝাটি, এমনকি ঠেলাঠেলিতেও আমাদের অবশ্য কোন বিকার হয় না । অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি, শিশুদেরকে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা দিলে তারা কোন এক মন্ত্রবলে নিজেদের সমস্যাগুলো প্রায়শই মিটিয়ে ফেলতে পারে । অবশ্য ইত্যবসরে দু'চারটি কিল থাপ্পড় ছোড়া হবে না দিব্যি করে সেটা বলা যাবে না । নজর রাখা ভালো ।

বোন এবং বোনজামাই দু'জনাই টরোন্টোর হাতে বেলা পরোটার ভক্ত । তারা আগেই জানিয়ে রেখেছে এই বস্তুটি যেন অঢেল জমিয়ে রাখা হয় । ভুনা গোশত আর পরোটা নাকি ঢাকার কথা মনে করিয়ে দেয় । মাঝবয়েসী মানুষদের বোধহয় স্মৃতি রোমন্থনের রোগ পেয়ে বসে । ছুটির দিনে খিঁচুড়ী খেতে বসলে নির্ঘাৎ বাল্যকালের অসংখ্য খিঁচুড়ীজড়িত স্মৃতিকথা মনের কপাট খুলে উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করে । অর্ধাঙ্গিনীর মাঝ বয়েসী হতে কিছু বাকি আছে কিন্তু সেও এই ব্যাপারে আমার চেয়ে কম যায় না । পরোটা এবং চিনি নিয়েও তার বহু স্মৃতি জড়িত আছে । ছোটবেলায় বাংলাদেশের মাটিতে বসে চিনি দিয়ে পরোটা খায়নি এমন কে আছে?

কথায় কথায় বেলা যায়। তাদের আসা উপলক্ষ্যে জনৈক বর্ষীয়ান মহিলার কাছে অর্ধশতাধিক পরোটা, কয়েক ডজন পুরি এবং সিঙ্গাড়ার অর্ডার দেয় শিলি। বেশ কয়েকজনের দ্বারে হানা দিয়ে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত এই মহিয়সীকে পেয়ে সে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। নিজ হাতে এই বেলা-বেলির কাজ সময়সাপেক্ষ, ফলে অনেকেই যারা এসব করেন সবসময় সবার অর্ডার নিতে পারেন না। তাছাড়া তারা কেউ কেউ শুধুমাত্র অতিরিক্ত সময়েই এসব করেন, কিছু অতিরিক্ত আয়ের সূত্র হিসাবে। বয়েসী ভদ্রমহিলাটির নাম জেনেছি আলেয়া। আগে পরে কি আছে জানা যায় নি। তিনি নিজেকে সবার কাছে এই নামেই পরিচয় দিয়ে থাকেন। আমরা তাকে কখনো দেখি নাই। এটাই তার কাছে আমাদের প্রথম অর্ডার দেয়া। আনতে গেলেই দেখা হয়ে যাবে।

আমার কাজ যেখানে, সেখানে গাড়ী চালিয়ে গেলেই সবচেয়ে অল্প সময়ে এবং অল্প ঝামেলায় পৌঁছানো যায়। টরোন্টো ডাউনটাউন থেকে যথেষ্ট উত্তরে এই এলাকা এখনও বেশ হাল্কা বসতি, একটু খুঁজলেই স্বল্প খরচে পার্কিং পাওয়া যায়। অধিকাংশ মানুষই যারা ডাউনটাউনে কাজ করতে যান পার্কিংয়ের ভয়াবহ খরচের কারণে সাধারণত গাড়ী নিয়ে যান না। ট্রেনে-বাসে যাতায়াত করেন। ভীড়-ভাট্টায় মাথা খোটার প্রয়োজন হয় না। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চলে যাওয়া যায়। কিন্তু ড্রাইভ করতেও মন্দ লাগে না। গান চালিয়ে দিয়ে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে ছন্দটাকে উপভোগ করতে করতে দুলকি চালে চলতে বিশেষ ধরণের আনন্দ আছে। কিছুদিন ধরে আমি সেই আনন্দ উপভোগ করবার সুযোগ পাচ্ছি।

অফিস ফেরতা পথে শিলির ফোন পেয়েই আন্দাজ করেছিলাম ফাউ হুজুতে জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছি। রহস্য উন্মোচন হতে বিরক্তির শেষ হলাম। সে আমাকে ভীড় ঠেলে স্কারবোরোর গভীরে ড্যানফোর্থ এভিনিউয়ের নিকটবর্তী ক্রিসেন্ট রোডের উপর অবস্থিত একটি এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে যাবার নির্দেশ দিলো। এখানেই আলেয়ার বসবাস। হাইওয়ে ৪০। এর উপর ভীড় থাকলেও গাড়ী তবুও এগোয়। সেখান থেকে এক্সিট নিয়ে লোকাল রাস্তায় উঠতেই বুঝলাম কত ধানে কত চাল। গাড়ী দুই পা যায় তো এক ঘন্টা অনড় বসে থাকে। অন্তত সেই রকমই মনে হলো। শাপ-শাপান্ত করতে করতে রেডিওর কণ্ঠ চড়িয়ে দেই, কিন্তু তাতেও গোস্বা যায় না। শিলিরই পিন্ডি চটকাতে থাকি। জেনে শুনে যে নিজের পতিকে এই পরিস্থিতিতে ঠেলে দিতে পারে তার চেয়ে নিষ্ঠুর আর কে হতে পারে? অকারণে হর্ণ দিতে শুনে মেজাজটা তড়াক করে ছাদ ফুটো করে গগনমুখী হয়ে গেলো। নিজের হর্ণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাক্কা দশ সেকেন্ড বাজিয়ে সকলের কান ঝালাপালা করে দিলাম। দিবি আর ফাউ হর্ণ? ফাজিল।

দেখতে দেখতে যেমন যৌবন চলে যায়। সেই একই গতিতে না হলেও এই যন্ত্রণা কাতর যাত্রারও সমাপ্তি নজরে পড়ে, দীর্ঘক্ষণ পরে। ইচ্ছে করেই ঘড়ি দেখা থেকে বিরত থাকি। সময়ের হিসেবটা আপাতত ভুলে থাকলেই ভালো। ক্রিসেন্ট রোডে একাধিক সুউচ্চ দালান রয়েছে। সেখানে গিয়ে খেয়াল হলো বিল্ডিংয়ের নাম্বার সহ অন্যান্য সব তথ্যই ক্রমশঃ বর্ধমান স্মৃতির চোরাবালিতে তলিয়ে গেছে। এই বয়েসেই যদি এই অবস্থা হয় তাহলে বার্ধক্যে কি হবে সেই চিন্তায় আমার অকালপক্ক ছেলেমেয়ে দুটিকে নির্লজ্জের মতো চোখ ঘুরিয়ে হাসতে দেখি প্রায়ই। অথচ এই ব্যাপারে তারাও কোন অংশেই কম যায় না। প্রায়ই তাদেরকে দেখি নিজেদের জিনিষপত্র হারিয়ে ভ্যা ভ্যা করে কান্না জুড়ে দিয়েছে। জননী দয়াপরবশ হয়ে খুঁজে দিলে তবে নিরস্ত হতে দেখি।

ফোন লাগাই বাসায়। ফার ধরে। চারে পড়ার পর থেকে বাসার ফোন অন্য কারো ধরবার উপায় নেই। সে লম্ফ ঝম্প দিয়ে চিলের মতো ছোঁ মেরে রিসিভারটাকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরে। তার কাছ থেকে সেটাকে উদ্ধার করতে বেগ পেতে হয়। কথা অবশ্য বেশী এগোয় না। কথা বলবার আগ্রহ তার কম। সে ফোন হাতে অন্যান্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বার তিনেক হ্যালো-হ্যালো করে চিৎকার করেও যখন কোন প্রত্যুত্তর পাওয়া গেলো না তখন বিরক্ত হয়ে শিলির সেলে ফোন লাগাই। এবার তাকে পাওয়া গেলো। জানা গেলো কন্যা আমার সাথে কথা বলতে আগ্রহী তবে তার আগে পুতুল পুত্রের খাওয়া শেষ করা প্রয়োজন; কিছু সময় লাগবে। রাগ করে কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে যাই। এই মেয়েটিই আমাকে যা একটু আদর যত্ন করে থাকে। তার মা এবং ভাই প্রায়ই আমার অস্তিত্বকে পরিপূর্ণভাবে অবহেলা করে থাকেন।

শিলির কাছ থেকে বিল্ডিং নাম্বার ফোন নাম্বার পাওয়া গেলো। এপার্টমেন্ট নাম্বার বা বাজার নাম্বার তার জানা নেই। আলেয়ার সাথে তার কথা হয়েছিলো একবার। তখন আলেয়া তাকে সঠিকভাবে জানাতে পারেননি। শিলি আমাকে সোজা সাপটা জানিয়ে দিলো আলেয়াকে ফোন করে জেনে নিতে। সে ব্যস্ত। ফোন কেটে যায়। বিরক্ত হই। বাজার নম্বর না জানলে ভেতরে ঢোকাটা কষ্ট। কেউ ঢুকলে তার সাথে ঢুকতে হয়। সাধারণত অসুবিধা হয় না; কিন্তু কখনো সখনো মানুষজন সন্দিহান দৃষ্টিতে তাকায়। ভাবখানা তুমি কে হে, ঢুকে গেলে যে?

আলেয়ার নাম্বারে ফোন করলাম। চারবার বেজে আনসারিং মেশিনে চলে গেলো। মেসেজ রাখলাম। পরোটা নিতে এসেছি; কিন্তু ভেতরে ঢুকতে পারছি না। এপার্টমেন্ট নাম্বারও জানা নেই। মেসেজ পাওয়া মাত্র ফোন দিতে অনুরোধ জানাই। পনেরো মিনিটেও যখন আমার ফোন বাজে না তখন আরেক কাঠি অতিরিক্ত বিরক্তি নিয়ে ফোন করি। চতুর্থবার বাজার পর আনসারিং মেশিন এ চলে গেলো, মেসেজ রাখবো কি রাখবো না ভাবছি তখন একটা ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠ পেছনের যান্ত্রিক কণ্ঠের সম্ভাষণকে চাপা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, 'আমি আলেয়া! আপনি কে? হ্যাগা?'

নাম বললাম। উদ্দেশ্য বললাম। ঠিকানা এবং বাজার নাম্বার দেবার অনুরোধ জানালাম।

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। - 'বাজার নাম্বারতো জানি না বাবা। এইটাতো লাগে না। দুনিয়ার মানুষ আইতাছে যাইতাছে, ঢুইকা পড়েন।'

মনে মনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ি। কোন বিটলার খপ্পরে না পড়লেই হয়। 'আপনার এপার্টমেন্ট নম্বর কত?'

আবার ক্ষনিকের নীরবতা। 'মনে নাই বাবা। দুই হাজার কিছু একটা। মাত্র চার মাস আসছি বুঝতাছেন না বাবা। এতো কিছু মনে রাখন যায়?'

শ্রাগ করি। এই ভদ্রমহিলা নিজের এপার্টমেন্ট নাম্বার পর্যন্ত না জেনে কিভাবে দিব্যি এমন একটা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন মাথায় ঢুকলো না। বললাম, তাহলে আপনি নিচে এসে দিয়ে যান। আমি দরজার সামনে থাকবো।

‘হেইডাতো পারুম না। আমার কাছে চাবি নাই। আমার মাইয়া আর জামাই কামে গেছে। আইতে আরো ঘন্টাখানেক।

মাথায় ব্যথার সংকেত পাই। একি বিপদে পড়লাম! পাক্কা একটা ঘন্টা ভিড় মাড়িয়ে মাড়িয়ে এই মুল্লুকে এসেছি এখন পরোটা না নিয়ে কোন অবস্থাতেই বিদায় হচ্ছি না। ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতি জরীপ করি। আলেয়ার কাছ থেকে কোন না কোন তথ্য নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

‘আপনি কোন তলায় থাকেন?’

‘কইলাম না দুই হাজার কিছু একটা।’ উল্টা ধমক এলো। ‘দুই হাজার হইলো বিশ তলা। এইডাও জানেন না।’

নীরবে হজম করি। ‘বিশ তলায় যাবার পর কি করবো?’

‘ডাইনে আইবেন। আমি দরজা খুইলা উঁকি দিমু। আমাকে দেখলেই চিনতে পারবেন। আমার মাথার চুল সব সাদা। আসেন। আমি পরোটা রেডি করতাছি।

লাইন কেটে গেলো। তাকিয়ে দেখলাম বহু অফিস ফেরত মানুষই দরজা খুলে সার বেঁধে ভেতরে ঢুকছে। ভেতরের লবীতে কিছু বুড়া-বুড়ি দল বেঁধে গল্প-সল্প করছে। শরতের শেষ প্রায়, বাতাস বেশ ঠান্ডা। সাধারণ জ্যাকেটে আর মানায় না। আমি নির্বিকার মুখে দুই ভদ্রলোকের পিছু নিয়ে সুড়ুৎ করে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। তারা দু’জন ফিরেও তাকালেন না। হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন আসছে যাচ্ছে, কেউ কাউকে প্রশ্ন করে না। অন্তত সেটাই ধারণা করেছিলাম। কিন্তু বুড়ো-বুড়ির দলটি থেকে যখন থুরথুরে একজন বুড়ি হাতের ষষ্ঠিতে খটাখট শব্দ তুলে আমার পথ রোধ করে দাঁড়ালো আমি অল্পবিস্তর ভড়কেই গেলাম। এ আবার কি আপদ!

‘কোথায় যাচ্ছো?’ শ্বেতাঙ্গ বুড়ি ইচ্ছে করেই কণ্ঠস্বর স্বাভাবিকের চেয়ে কর্কশ করে প্রশ্ন ছুড়ে দিলো।

ভড়কে যাই। যেখানেই যাই বুড়ির তাতে কি? আমাকে জেরা করার অধিকার তাকে কে দিয়েছে?

‘এইতো, উপরে।’ আমতা আমতা করে বলি। বুড়ি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত পরখ করে। ‘এই দালানে যারা থাকে তাদের সবাইকে চিনি আমি। ছেলে-মেয়ে নারী-পুরুষ সবাইকে, তুমি বাইরের। ভেবেছো বুড়ো হয়েছি বলে মানুষ চিনি না। তোমার মত বদমায়েশকে আমি বাতাসে তুলে আছাড় মারতে পারি .....।’

এই বার রীতিমতো ঘাবড়ানোর পালা। বেশী হৈ চৈ শুরু করলে অন্যরাও থেমে যাবে, সিকিউরিটিকে ডাকা হতে পারে, সে আরেক নাজুক অবস্থা। বুড়ির সঙ্গী এবং সঙ্গীনিরা দল পাকিয়ে এগিয়ে এলো।

বুড়ি তর্জনী নাচিয়ে ধমক দিচ্ছে, ‘ইচ্ছে করলেই তুমি ঢুকে যেতে পারো না। দাঁড়াও আমি পুলিশে খবর দিচ্ছি। ফোন আছে কারো কাছে?

না সূচক মাথা দোলানোর বহর লেগে গেলো। বুড়ি আমার দিকে তাকালো। 'তোমার ফোনটা দাও।'

আমি চারদিকে দ্রুত চোখ বোলালাম। বেশী বিপদ দেখলে ঝেড়ে দৌড় দেবো। পরোটা চুলোয় যাক। সারা দুনিয়ার মানুষ যেখানে সেখানে ঢুকে যাচ্ছে আর আমার কপালে এসে জুটেছে এই যুধিষ্ঠির। আমি হাবার মতো মাথা দোলাই। কিসের ফোন?

বুড়ি চোখ কুচকে আমাকে দেখলো। 'বেশী চালাক তুমি, যাও, আজকের মতো তোমাকে ছেড়ে দিলাম। আবার যদি দেখি পুলিশ ডাকবো। মনে থাকে যেন।'

পরিত্রাণের নিঃশ্বাস ফেলে দৌড়ে এলিভেটরে সওয়ার হই। পূর্ণ সে তরী। অফিস ফেরত ট্রাফিক মিলেছে ছেলে মেয়েদের বৈকালিক আন্তঃএপার্টমেন্ট ভ্রমণের সাথে। প্যানেলের প্রতিটি বোতামই জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। দুই থেকে শেষ পর্যন্ত। ধৈর্যের অবতার বনে যাবার চেষ্টা করি। এলিভেটরের এক কোণে হেলান দিয়ে দু'চোখের পাতাও লাগিয়ে ফেলি কয়েক মুহূর্তের জন্য।

গন্তব্যে নেমে আলেয়ার নির্দেশ মোতাবেক ডানে এগিয়ে যাই। সুদীর্ঘ করিডোর বেয়ে হাটতে থাকি, আশা করি আলেয়া দরজা খুলে বাহিরে আসবেন। সে আশায় গুড়ে বালি। তিনবার পুরো বিশ তলার করিডোর চক্কর মারলাম। আলেয়ার কোন দেখা নেই। আবার ফোন করলাম। এবার দুয়ার খুললো। আলেয়ার দর্শন পাওয়া গেলো। ভদ্রমহিলার বয়েস ষাটের কাছাকাছি। বয়েসের তুলনায় বার্ধক্যের ছাপ বেশীই মনে হলো যদিও ঠোটের ডগায় চমৎকার এক টুকরো হাসি ঝুলছে।

"খুব কষ্ট পাইলেন বাবা। আমি তো বেশী বাইরে যাই না, সব ভালোমতো চিনি না। ভেতরে আসেন। ওরা তো কেউ নাই।"

ভেতরে ঢুকি। পরিপাটি করে সাজানো দুই বেডরুমের এপার্টমেন্ট। দামী সোফা, ডাইনিং টেবিল। দেয়ালে রুচিসম্পন্ন তৈলচিত্রের ডুপ্লিকেট। রান্নাঘরে অবশ্য লন্ডভন্ড। আলেয়া নতুন অর্ডার পেয়েছেন। কাজ করছিলেন। আমাদেরটা আগেই করেছেন। ফ্রিজে ছিলো। হাসি মুখে বললেন, 'অনেক অর্ডার পাই বাবা, সেই আমেরিকাতেও আমার পরোটা যায়। মানুষ খাইয়া খুশী হয়। মনডা ভালো লাগে। বাসায় বইসা কিছু করনতো লাগে, নাকি? এই দ্যাখেন আপনার লগে আরো তিনডা অর্ডার, হেরাও আইয়া পড়বো একটু পরেই।'

ভালো। নীচে পাগলি বুড়ির খপ্পড়ে পড়লে পরোটা খাবার সখ চলে যাবে। বুড়ি চলে না গিয়ে থাকলেই হয়। শুধু আমি একাই কেন বকা খাবো?

আমি দ্রুত টাকা পয়সা মিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম আলেয়া থামালেন। 'ছবি দ্যাখবেন না একটু? আমার দুইটা নাতি। যা দুষ্ট! দাঁড়ান এলবামটা লইয়া আসি, একটু খাঁড়ান।'

আমাকে লিভিংরুমে দাঁড় করিয়ে রেখে আলেয়া শোবার ঘরে গেলেন এলবাম আনতে। আমি হাসবো কি কাঁদবো বুঝি না। জানা নেই শোনা নেই এতোখানি বিশ্বাস করাটা কি তার ঠিক হচ্ছে? কত পদের মানুষ আছে এই শহরে।

আলেয়া আমাকে সম্পূর্ণ এলবাম না দেখিয়ে ছাড়লেন না। তার একটাই মেয়ে। নার্স। তার শিশুকালের ছবিও দেখতে হলো। ছবি দেখা শেষ হতে তিনি কিছুক্ষণ আমার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আপনি কি চান বাবা? ভুইলা গেছি।'

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ি। আলেয়ার মেয়ের সাথে শিলিকে আলাপ করতে বলবো বলে মানসিকভাবে নিজেকে নির্দেশ দিয়ে রাখি। বেচারী হয়তো জানেও না তার মায়ের স্মৃতিশক্তি কেমন নাজুক পর্যায়ের। পরোটার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে ভয়াবহ লজ্জিত হলেন 'ছিঃ ছিঃ, কি পাগোলডা হইছি আমি কন দেহি? এক্কেরে ভুইলা গেছি। বয়েস হইতাছে। কিন্তু আমার পরাডা খাইলে জিভে লাইগা থাকবো। একটা ভাইজা দিমু? আলু ভাজি আছে।'

আলু ভাজি? আমি দোদুল্যমান হয়ে পড়ি। দুপুরে সামান্যই খাই। ক্ষিধায় পেট ইতিমধ্যে চোঁ চোঁ করছে। পরোটা আলুভাজির প্রসঙ্গ উঠে পড়ায় জিভে পর্যন্ত লালা গড়িয়ে পড়ছে। অনেক কষ্টে লোভ সংবরণ করে পরোটা এবং পুরির ব্যাগ নিয়ে করিডোরে নামি। রাস্তায় কি ধরণের ভীড়ে পড়বো সেটা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছি। এলিভেটর পেতে কিঞ্চিৎ দেরী হলো। নীচে নেমে বুড়িকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আনন্দিতই হলাম। আমার পরে যারা আসছে তাদের কপালে যে ভোগান্তি আছে সেটা মানসচক্ষে দেখে মনে মনে বেশ একটা হাসিও হলো। আমাকে দেখেই চোখ ছোট ছোট করে তাকালো বুড়ি। হাতে ঝোলা দেখ্‌লো। তর্জনী উঠে গেলো। নিঃশব্দ শাষানী। আবার এসেছো তো মরেছো। আসতে আমার বয়েই গেছে। গাড়ীতে উঠে আমি ভো করে পগার পার হয়ে যাবো। আমি মুখ বাকিয়ে হেসে সদর দরজা ঠেলে বেরিয়ে যাই। পেছনে দরজা সশব্দে বন্ধ হয়ে যায়।

গাড়ীর দরজা খুলে মাত্র হাতের মালামাল খালাস করেছি ফোন বেজে উঠলো। শিলি।
"একটা সমস্যা হয়ে গেছে।" সে বললো।
'কি সমস্যা' মেজাজ দেখিয়েই বলি। বাসায় ফিরতে চাই। খাতির করছি ভাবলে আরো দশটা কাজ চাপিয়ে দেবে।

'আলেয়া ফোন করেছিলো। তুমি এলিভেটরে ওঠার পর পরই। তোমাকে ভুল ব্যাগ দিয়েছে।'

'কি!' আমি স্পষ্টতই ধমকে উঠি।

কিছুক্ষণ নীরব অন্য পক্ষ। 'আবার একটু যাও প্লিজ। আমাকে খুব করে বলেছেন উনি। প্লিজ?'

বিরক্ত চোখে সদর দরজার ওপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টির বুড়িকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই সেই অবান্তর চিন্তা নিমেষে বাদ দিলাম। এবার আমার মাথা আস্ত চিবিয়ে খাবে।

'কম দিয়েছেন না বেশী দিয়েছেন?' লজ্জার মাথা খেয়ে জানতে চাই।

'বেশী। অনেক বেশী।'

বুক ভরে শ্বাস নেই। একটু চামারগিরি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমি নিরুপায়। বললাম, 'ফোন করে বলে দাও আমাকে পাওনি।' লাইন কেটে দিই।

সেই পরোটা আমরা সবাই মিলে খুবই তৃপ্তি সহকারে খেলাম। আলেয়া মিথ্যে বলেননি। তার পরোটার স্বাদ অতুলনীয়। সবাই খেয়ে বাহবা দিলাম। যদিও বন্ধু মহলে কিঞ্চিৎ বদনাম হয়ে থাকবে। আলেয়ার মেয়ের সাথে আমাদের এক ঘনিষ্ট বন্ধু পরিবারের স্ত্রীর গলায় গলায় ভাব। জানা গেলো আমি এমনিই হীন ব্যক্তি যে এক বৃদ্ধার স্মৃতিভ্রমের সুযোগ নিয়ে বেশী পরোটা হাতিয়ে সটকে পড়ি। আমার মতো মানুষদের জন্যেই পৃথিবীতে এতো ব্যথা-বেদনা।

আরে বাহ্। যত দোষ নন্দ ঘোষের।

ষোল আনাই মিছা

এক চমৎকার ফুরফুরে গ্রীষ্মের দিন কিভাবে একাধারে হাস্যকর এবং ভীতকর অভিজ্ঞতায় পূর্ণ হয়ে যেতে পারে কয়েকটি মুহূর্তের ব্যবধানে সেই কাহিনী না বললেই নয়। টরোন্টোতে গ্রীষ্ম স্বল্পস্থায়ী সে কথা বলার প্রয়োজন নেই। দল বেঁধে পার্কে যাওয়াটা একটা রীতি। এই একটি ব্যাপারে আমি সর্বদাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকি। এই দিনে আমরা প্রায় পাঁচ-ছয়টি পরিবার মিলে চললাম টরোন্টোর নিকটবর্তী টাউন অব কর্টিস-এ অবস্থিত ডার্লিংটন প্রভিনশিয়াল পার্কে। এই পার্কটিতে আমার পূর্বে কখনও যাওয়া হয়নি। আবার অনুভব করি কবিগুরুর সেই 'ঘর হইতে দুই পা' না ফেলিবার সত্যতা। এই পার্কটিই আমার বাসস্থান থেকে সবচেয়ে কাছে, এখানেই কখনো আসা হয় নি। অথচ দুনিয়ার তাবৎ পার্ক চষে বেড়িয়েছি।

পার্কে পৌঁছাতে পৌঁছাতে দুপুর পেরিয়ে গেলো। বাচ্চা-কাচ্চা সাজিয়ে-গুজিয়ে খাবার-দাবার বোঁচকা-বুচকি বেঁধে, এটা-সেটা করতে করতেই সকাল কিভাবে যেন গড়িয়ে যায়। কিন্তু গ্রীষ্মের দিনগুলো এতো দীর্ঘ যে একটু বিলম্বে পৌঁছালেও আনন্দের তেমন কোন ফারাক হয় না। আটটায় অথবা আরো পরে আকাশে আলো মোছে।

ডার্লিংটন পার্কটি লেক ওন্টারিওর শরীর ঘেষে অবস্থিত। চমৎকার বালুর সৈকত, বাচ্চাদের খেলা এবং গোসল করবার জন্য মোক্ষম। অনতিদূরেই লেক ওন্টারিওর উত্তাল জলরাশি থেকে রক্ষিত ম্যাকলাফলিন বে অবস্থিত। প্রশস্ত বালিয়াড়ি দুই জলের রাশিকে পৃথক করে রেখেছে, মাঝে একটি সংকীর্ণ যোগসাজশ আছে। ফলে ম্যাকলাফলিন বে-র পানি তুলনামলূকভাবে স্থির, ঢেউয়ের এবং স্রোতের অত্যাচার অনেক কম। এখানেই দাড় বাওয়া নৌকা চালানো যায়। পার্কে ঢুকেই লক্ষ্য করেছি বে-র পাশেই একটি নৌকা ভাড়া দেবার ষ্টল রয়েছে। ষ্টলের পাশেই থরে থরে সাজানো কাঠের ডিঙ্গির মতো দেখতে নৌকাগুলো। বেশ কয়েকটি পানিতেও ভাসছে। কিছু দেখলাম পদচালিতও রয়েছে তার মধ্যে। যারা এগুলো দেখেননি তাদের অবগতির জন্য। এই চৌকা আকারের ভাসমান নৌকাগুলোয় সাইকেলের মতো প্যাডেল আছে। বসে সেই প্যাডেলে চাপ দিলেই একটা প্রপেলার ঘোরে। নৌকা এগুতে থাকে। এটার জনপ্রিয়তা কম। সবাই ডিঙ্গি নৌকাই পছন্দ করে। এগুলোর সাথে দেশী স্টাইলের দাড় আছে। স্থির পানিতে চালানো খুবই সহজ। আমার এই ব্যাপারে বিশেষ রকমের আগ্রহ আছে।

আমি যেখানে যাই একটি Inflatable প্লাষ্টিকের নৌকা সঙ্গী করে নেই। সাথে আছে মটর চালিত পাম্প। পাঁচ মিনিটেই দিব্যি তিনজনের বসার উপযোগী নৌকা তৈরি হয়ে যায়। অস্বীকার করবার উপায় নেই ডিঙ্গি নৌকার সাথে তুলনায় এই বস্তু তুচ্ছ কিন্তু কাজ চলে যায়। নিদেনপক্ষে ঘন্টায় দশ-বারো ডলার করে তো আর ভাড়া গুনতে হয় না। পার্কে ঢোকার মুখেই বেশ কিছু টাকা দিতে হয় প্রবেশমূল্য হিসাবে। বেড়াতে আমরা সবাই চাই কিন্তু আর্থিক দিকটাও খেয়াল রাখতে হয়। ট্যাক্সেই যেখানে চলে যায় অর্ধেকের বেশী।

প্লাষ্টিকের নৌকার সাথে আর যে বস্তুটি আমি গ্রীষ্মে সর্বদা সাথে নিয়ে ঘুরি সেটা হলো তাবু। আধুনিক প্রযুক্তির কৃপায় বিশাল এক তাবু ছোট্ট ব্যাগে নিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়ানো যায়। প্যারাসুট কাপড়ের ভেতরে নমনীয় কিন্তু দৃঢ় ফাইবার গ্লাসের দন্ড ব্যবহার করে কয়েক মিনিটেই দিব্যি মজবুত তাবু বসিয়ে দেয়া যায়। ছোট বাচ্চা কাচ্চা থাকলে এই বস্তুটি বিশেষ রকম কাজে দেয়। কিছু ছোটাছুটি এবং উপদ্রবের পর শিশুরা অধিকাংশই গভীর ঘুমে তলিয়ে যায়। তাবুর ভেতরে তাদের নিদ্রা অবধারিতভাবে নিরুপ্রদ্রব থাকে। মাঝে মাঝে মহিলারাও সেখানে রোদ থেকে আশ্রয় খোঁজেন। অধিকাংশ বাংলাদেশী মহিলারাই সর্ব শরীর আবৃত করে সৈকতে গিয়ে থাকেন। চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকা স্বল্প বস্ত্রের বিদেশী নারীদের পাশে তাদেরকে দেখায় খৃষ্টান ধর্মের নানদের মতো। পানিতে পা ডোবানো ছাড়া আর কোন কর্মতৎপরতা দেখানোর চেষ্টা তারা করেনও না, করানো যায়ও না। সুযোগ পেলেই তারা তাবুর ভেতরের শীতলতায় গোপনে দিবানিদ্রা দেবার অপচেষ্টা করে থাকেন। শিলিকেই আমি বেশ কয়েকবার হাতে নাতে ধরেছি। এদেশী মেয়েগুলি নিশ্চয় অন্তরঙ্গ পরিবেশে দক্ষিণপূর্ব এশীয় মেয়েগুলিকে নিয়ে একশ একটি ঠাট্টা মশকরা করে থাকে। তাদের সুইমিং কষ্টিউমের ক্ষুদ্রতার পাশে জিনস এবং ফুলশার্ট পরিহিতা এই দেশী রমনীগুলিকে আমার কাছেই হাস্যকর মনে হয়। আর কিছু না হোক একটা হাত কাটা টি শার্ট পরলে তো আর মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। এই গরমে বস্তা পরে ঘেমে নেয়ে যাবার কোন যৌক্তিকতা দেখিনা। কিন্তু নিজ ঘরনীকেই বোঝাতে পারি না, অন্যদের কথা কি বলবো।

আমাদের সাথে এসেছেন লিটন মামা এবং এলিস ভাই। তারা দু'জনাই প্রায় আমার বয়েসী, ভায়রা ভাই এবং দু'জনরাই দুই বছরের দু'টি শিশু রয়েছে। তাবু পাততেই তারা সেটির আশে পাশে নোঙর গেড়ে ফেললেন। আমি বালুর পাশেই তাবু গেড়ে থাকি যেন বাচ্চারা বালুতে খেলার কিছু সুযোগ পায় এবং বাবা-মায়েরা যারা একটু নিরুপদ্রব সময় কাটাতে আগ্রহী তারাও তাবুর ভেতরে বা বাইরে বসে বাচ্চাদের দিকে নজর রাখতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই বন্ধু হাসান এবং ফেরদৌসও তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে এসেছে। সব মিলিয়ে অনেক বাচ্চা। তাদের ফুর্তি ও হৈ চৈ দেখে আমারই হৃদয় শিশুর মতো নেচে উঠলো। কোন রকমে পেটে কিছু বয়ে আনা নাস্তা চালান করে দিয়ে সবাই ছুটলাম পানিতে। উষ্ণ পানির ছোঁয়ায় মুহূর্তেই শরীর ও মন জুড়িয়ে গেলো। কিছুক্ষণ দাপাদাপি, পানি ছিটাছিটি এবং সাঁতার কাটবার ব্যর্থ প্রয়াস শেষে যখন সবাই তাবুতে প্রত্যাবর্তন করলাম তখন সবারই ক্ষুধায় নাড়ি জ্বলছে। খাবারের বহর দেখে হৃদয় দ্বিতীয়বারের মতো নেচে উঠলো। সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা নানান জাতের খাবারের রূপে ও গন্ধে স্থির থাকাই কঠিন। মাঝে মাঝে পার্কে চুলা জ্বালিয়ে রান্না করলেও আজ সেই ঝামেলায় কেউ যেতে চায় নি। আমাদের দয়ার্দ্রচিত্ত গৃহিনীরা বাসা থেকেই খাবারের এই বিপুল আয়োজন করে এনেছেন। খাদ্যে আমার কখনই অরুচি নেই। বয়েসের সাথে সাথে ক্যালরির হিসাব মাথার মধ্যে একটু যুৎসহকারে চেপে বসেছে কিন্তু এই জাতীয় অনুষ্ঠানে সেই সব হিসাব ভুলে থাকারই চেষ্টা করি। খাওয়া-দাওয়া-আড্ডা চললো কিছুক্ষণ। ইচ্ছে ছিলো একটি গড়িয়ে নেবো কিন্তু বিচ্ছুগুলোর জন্য সম্ভব হলো না। তারা সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে আমার ইনফ্লাটেবল (Inflatable) বোটে উঠবে তাই।

বোটে বাতাস ভরে বিচ্ছুগুলোর ঘাড়ে সেটাকে তুলে দিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করতে করতে কর্তাবাবুর মতো ভীড় ঠেলে ম্যাকলাফলীন বে-র দিকে এগিয়ে গেলাম আমরা। হাসানও আমার সঙ্গি হয়েছে। তার দু'টি মেয়ে-বড়টি তাপতি, চৌদ্দতে

পড়লো; ছোটটি অবিলিয়া-টরোন্টোর ক্ষুদে নৃত্যকন্যা, বয়েস চার। তাদের প্রচুর আগ্রহ। আমার দু'টি-জাকি ও ফারও দল পাকিয়েছে তাদের সাথে। ফেরদৌসের বড় মেয়ে ইভানাও রয়েছে এই দলে। সে এগারো। তার আগ্রহই সবচেয়ে বেশী। আমাদের থেকে যথেষ্ট দূরত্ব রেখে ঢিমেতালে অনুসরণ করছে শিলি, হাসানের স্ত্রী জেরিন ভাবী এবং ফেরদৌসের স্ত্রী মুন্নী ভাবী। লিটন মামা এবং এলিস ভাই জানিয়েছেন তাদের দ্বিবর্ষীয়দের কিঞ্চিৎ বিশ্রাম হলে তারাও দল বেঁধে আমাদের সাথে ম্যাকলাফলীন বে-তে যোগ দেবেন। ফেরদৌসেরও একটি এক বছর বয়েসের ছেলে আছে। সে পানি দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। তাকে নিয়ে সৈকতে হাঁটাহাটি করছে সে। ছেলে ঠাণ্ডা হলে আমাদের সাথে বে-তে যোগ দেবে।

ম্যাকলাফলীন বে বিশাল এক দীঘির মতো। শুরুতে অপ্রশস্ত হলেও ধীরে ধীরে চওড়া হয়ে গেছে এবং এক তীর থেকে অন্য তীর কোথাও কোথাও সিকি মাইলের বেশী হবে বলেই মনে হলো। তীরের পাশ থেকে বেশ ঘন করে গজিয়ে উঠেছে গাছ-পালা। নরম বালুতে হাটতে অসুবিধা হলেও একধরণের ভিন্ন আমেজ আছে। নৌকা ভাড়া দেবার ষ্টলের সামনেই ঘাট; কিন্তু তাদের নৌকার ভীড়ে আমার ডাব্বা প্লাষ্টিক বোটটাকে নামানোর জায়গা পাওয়া গেলো না। কিছুক্ষণ ব্যর্থ প্রয়াস করে বিচ্ছুগুলোকে নিয়ে তীর ধরে হেটে আরেকটু সামনে গিয়ে অগভীর কিন্তু মোটামুটিভাবে পরিষ্কার পানিতে নৌকা নামিয়ে দিলাম। পানিতে স্রোত কম থাকায় তীর ঘেষে নানান ধরণের জলপ্রিয় উদ্ভিদ গজিয়ে উঠেছে। শাপলা ফুল জাতীয় বেশ কিছু জলজ লতানো গাছ বিশাল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ছোট ছোট হরেক রকমের ফুল ফুটে রয়েছে। এই সব উদ্ভিদের অধিকাংশরই নাম জানা নেই। সৌন্দর্যটুকুই উপভোগ করছি, পরিচয় না হয় নাইবা জানলাম।

নৌকা পানিতে নামার সাথে সাথেই যে দৃশ্যের সুচনা হলো তা সন্তানহীনের কাছে অভাবনীয় হতে পারে, আমার কাছে নয়। এমন কিছু একটির শংকা মনের কোণে আগেই জমা হয়েছিলো। নৌকার মাঝি এই শর্মা। আমি ছাড়া আর দু'জন আরোহী নেয়া যাবে। বাচ্চাদের হয়তো দু'জনার বেশী নেয়া সম্ভব কিন্তু আমার কাছে দু'টি শিশু কিশোর উপযোগী লাইফ জ্যাকেট আছে। আমি নিজে সাতারের 'স' না জানায় পানিতে নামার সময় কখনো লাইফ জ্যাকেট পরতে ভুলি না। সমস্যা দেখা দিলো কে কার আগে যাবে তাই নিয়ে। কিছুক্ষণ হৈ-হট্টগোল চললো, চীৎকার-কান্নাকাটিও হয়ে গেলো, আমার মেয়েটিই এই ক্ষেত্রে অগ্রনী ভূমিকা পালন করলো বরাবরে মতই, অবশেষে জনতা শান্ত হলো। ঠিক হলো ইভানা এবং ফার যাবে প্রথমে, জাকি ও তাপতি তার পরে। অবিলিয়া এবং হাসান শেষে।

প্রথম দু'টি যাত্রা ভালোয় ভালোয় গেলো। আমার বোটে দু'টি দাড়। বোট সংলগ্ন দু'টি রিঙের ভেতরে দাড় দুটিকে বসিয়ে দুই হাতে বাওয়া যায়। শান্ত পানিতে সামান্য অভিজ্ঞতাতেই নৌকাটিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। স্রোত থাকলে ব্যাপারটা কঠিন হয়ে যেতে পারে। আমি দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করছি বিধায় মোটামুটিভাবে সব পরিস্থিতিই সামলাতে পারি। বাচ্চাগুলিকে নিয়ে তীর ধরে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে, কয়েকটি জলজ পুষ্প তুলবার সুযোগ করে দিয়ে তাদেরকে তীরে পৌঁছে দিলাম। তাপতির দাড় বাইবার বিশেষ রকম আগ্রহ থাকায় তাকে স্বল্পক্ষণের জন্য বাইতে দিলাম। অনভিজ্ঞ বিধায় নৌকা প্রথমে বিক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে নেচে বেড়ালেও সে দ্রুতই কৌশলটা ধরে ফেললো। আমার পক্ষ থেকে নুন্যতম সাহায্যেই নৌকা স্থির রেখে তীরে পৌঁছে গেলো সে। তার আনন্দ এবং উত্তেজনা দেখে ভালো লাগলো। নৌকা বাওয়ার ব্যাপারটা দেখে যত সহজ মনে হয় বাস্তবে তা নয়। পূর্বে সেই অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে যা ঘটলো তেমন পরিস্থিতিতে কখনো পড়তে হয়নি।

হাসান এবং অবিলিয়ার যাবার পালা এবার। সমস্যা দেখা দিলো মাঝি নিয়ে। আমার সাথে বড়দের লাইফ জ্যাকেট মাত্র একটি। হাসান ভালো সাতার জানলেও নিরাপত্তার কথা ভেবে আমি নৌকায় কাউকেই লাইফ জ্যাকেট ছাড়া উঠতে দেই না। তাপতি যেটি পরেছে সেটা হাসানের বপুতে লাগার সম্ভাবনা শূন্য। তাপতির হাবে ভাবে মনে হলো সে দাড় বাওয়ার ব্যাপারটা ভালোই ধরে ফেলেছে এবং অভিজ্ঞ মাঝি না হলেও তার চলবে। এমন শান্ত পানিতে কি আর সমস্যা হবে এই জাতীয় একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে আমি এই নবীন মাঝিনীর হাতে নৌকা সোপর্দ করে ডাঙ্গায় উঠে পড়লাম। অবিলিয়া সাতার না জানলেও নির্ভয়। সে এক লাফে নৌকায় উটে জাকিয়ে বসে পড়লো। বন্ধু হাসান আমার লাইফ জ্যাকেট পরে ধীরে সুস্থে নৌকায় সওয়ার হলো। সবাই সুস্থির হতে তাপতি দাড়ে গতির সঞ্চার করলো। তরী স্বাচ্ছন্দ্য গতিতে ম্যাকলাফলীন বে-র ঝকমকে নীল পানিতে রাজহংসের মতো সাবলীল গতিতে ভেসে গেলো। তাদের পিতা এবং পুত্রীদেরকে এই রৌদ্রোজ্বল প্রাকৃতিক পরিবেশে কিছু চমৎকার সময় কাটানোর সুযোগ দিয়ে আমি চললাম ছিপ নিয়ে কিছু চুনোপুটি ধরা যায় কিনা সেই প্রচেষ্টায়।

মহিলাদের ছোট দলটাকে পেছনে রেখে তীর ধরে ঘন ঝোপঝাড় ভেঙে এগিয়ে গেলাম বড়শি ফেলার মতো একটা যুৎসই স্থান বের করতে। কয়েকশ গজ যাওয়ার পর কিছুটা উন্মুক্ত স্থান পাওয়া গেলো। চারদিকে প্রচুর মাঝারি আকারের গাছ-পালা, তাদের ডাল বাঁচিয়ে সাবধানে বড়শি ছুড়ি। পনেরো-বিশ মিনিটেও একটা সামান্য ঠোকরও না পেয়ে আরোও দুরে সরে গেলাম। বন্ধু তার মেয়েদেরকে নিয়ে ইতিমধ্যে তীরে ফিরে গেছে বলেই ধারণা করে নিয়েছি। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে বে-র ঐ দিকটাতে দৃষ্টি চলে না।

হঠাৎ শিলির তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর কানে এলো। ভালোবাসার ডাক নয়। জরুরী তলব। ঝোঁপ ঝাড় ভেঙ্গে বেরিয়ে এলাম। সে আমার খোঁজে হাঁটতে হাঁটতে অনেকখানি পথ চলে এসেছে। তার মুখে যে সমস্যার বিবরণ পেলাম তাতে ততক্ষনাৎ খুব একটা বিচলিত বোধ করলাম না। নিজ চক্ষে পরিস্থিতি বোঝার জন্য বোট ভাড়ার ষ্টলের দিকে কিছুদূর হেঁটে এলাম। যে দৃশ্য দেখলাম সেটা বিশেষ আতংকজনক কিছু নয় বরং কিঞ্চিৎ হাস্যকর। তীর থেকে কয়েকশ ফুট দূরে নৌকায় বসে হাসান এবং তাপতি একনিষ্ট মনে দাড় বেয়ে চলেছে, শুধু সমস্যা দেখা দিয়েছে নৌকার গতিপথ নিয়ে। বিটকেল বস্তুটা নিজ অক্ষের চারদিকে লাটিমের মতো ঘুরে চলেছে, তীরমুখী এক ইঞ্চিও এগিয়ে যাবার কোন লক্ষণ তার নেই।

আমি একটু অবাক কণ্ঠে বললাম, ওরা ওখানে গেলো কেন? আমি তো বলেছিলাম তীরের কাছে থাকতে।'

জেরিন ভাবী উদ্বিগ্ন মুখে পানির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তিনি ইতস্তত ভঙ্গিতে বললেন, 'ওরা তো যেতে চায় নাই, নৌকা ভাসতে ভাসতে চলে গেলো।'

শিলি বললো, 'ওনারা কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে তীরে আসার চেষ্টা করছেন। পারছেন না। তুমি একটা নৌকা ভাড়া করে যাও।'

নৌকা ভাড়ার ষ্টল বন্ধ হয়ে যায় ছয়টার সময়। ছয়টা বাজতে মিনিট দশেক বাকি। শিলি আমাকে তাড়া দিচ্ছে। আমি অকারণে কতগুলো টাকা গচ্চা দিতে অনীহা বোধ করলাম। পরিস্থিতি দেখে মনে হলো না তারা এমন কোন বিপদে আছে। ছোট্ট অবিলিয়াও হাসি হাসি মুখে ঘন ঘন হাত নাড়ছে। বাবা এবং বড় বোনের তটস্থতা দেখে সে মনে হয় বেশ মজাই পাচ্ছে। কারণ দূর থেকেও তার ঝকমকে সাদা দাঁতের সারি দেখা যাচ্ছে। তার পিতৃদেব এবং জ্যেষ্ঠ ভগ্নির তটস্থতা দেখে এতো দূর থেকেও বুঝতে বিলম্ব হলো না অবিলিয়ার এই স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে ভাগ বসানোর মতো মানসিক অবস্থা তাদের নেই। কম করে হলেও মিনিট বিশেক ধরে এলোপাথাড়ি দাড় বেয়ে দু'জনাই কম বেশী ক্লান্ত। ইতিমধ্যে পিতা-পুত্রীতে হয়তো ছোট খাটো একটা বচসাও হয়ে থাকবে কারণ কিছুক্ষণ পর পরই তাপতিকে ধমকে উঠতে দেখলাম। দূরত্বের কারণে এবং ভাষাগত ব্যবধানের কৃপায় যথার্থ সংলাপ না বুঝলেও তা যে খুব মধুময় নয় হাসানের আষাঢ়ের মেঘময় আকাশের মতো মুখ দেখে বুঝতে অসুবিধা হলো না। অথচ বেচারার কোন দোষ-ই নেই। তখন যদি তাপতি আগ বাড়িয়ে এমন গভীর আত্মবিশ্বাস না দেখাতো তাহলে সে কখনই এই বিশ্বস্ত এবং অভিজ্ঞ মাঝিকে না নিয়ে মাঝ দরিয়ায় নৌকা ভাসিয়ে দিতো না।

শিলি ধমকে উঠলো, 'হা করে চেয়ে থাকলে চলবে? কিছু একটা করো।'

জেরিন ভাবীর মনে হলো চিন্তা শক্তি লোপ পাবার উপক্রম হয়েছে। তিনি উদাস কণ্ঠে বললেন, 'আপনে ক্যামনে এই পাগলটার হাতে সোনার টুকরা মেয়ে দুটাকে তুলে দিলেন? কি হবে এখন? ওরাতো ভাসতে ভাসতে কোথায় চলে যাবে।'

বুঝলাম কিছু একটা তৎপরতা না দেখালে বিপদ এই তীরে বসে আমারও সঙ্গি হতে পারে। আমি হাঁক-ডাক দিয়ে বন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। মিনিট দুয়েক চেঁচা-মেচি করে কিভাবে দাড় বাইতে হবে সেই কৌশল শেখানোর চেষ্টা করতে গিয়ে বুঝলাম এই পন্থায় বেশী দূর অগ্রসর হওয়া যাবে না। কারণ নতুন বিদ্যা প্রয়োগ করতে গিয়ে নৌকার ঘূর্ণন না কমলেও দূরত্ব বাড়তে লাগলো।

লক্ষ্য করলাম মজা দেখতে বেশ একটা জনতার ভীড় জমে গেছে। আমার মতই অধিকাংশই পরিস্থিতির মন্দ দিকটুকু এখনও পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন না করায় অনেকের মুখেই গালভর্তি হাসি দেখা গেল, কেউ কেউ ভিডিও ক্যামেরা খুলে ভিডিও করতেও লেগে গেছে লক্ষ্য করলাম। এই দৃশ্য ইন্টারনেটে উঠে গেলে অবাক হবো না, আজকাল পরিস্থিতিই এতই সঙ্গিন হয়েছে যে কেউ হাঁচি দিলেও তা ইউ টিউবে চলে আসে এবং মুহূর্ত পেরুবার পূর্বেই কয়েক সহস্র মানুষ তা দেখে ফেলে।

নিরুপায় হয়ে নৌকা ভাড়া করতেই গেলাম। দুর্ভাগ্য আমাদের, ষ্টল সামান্য কিছু আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। পার্কের কর্মচারীদের কয়েকজন তখনও সেখানে ঘোরাঘুরি করছিলো, তাদের কাছেই এবার সাহায্যের আবেদন জানাতে হলো। জানা গেলো এই জাতীয় পরিস্থিতিতে রেসকিউ টিম পাঠানোর নিয়ম। তাদের নৌকা এবং মটর রয়েছে কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে অন্যখানে। আজ গ্রীষ্মের চমৎকার দিনগুলির একটি হওয়ায় মানুষজনের এমনই ঢল নেমেছিলো যে গণশৌচাগারে পাইপ ফেটে গিয়ে চারদিক নোংরা পানিতে সয়লাব হয়ে গেছে। সেই ঝামেলা না মেটানো পর্যন্ত উদ্ধারকার্য স্থগিত রাখা ছাড়া উপায় নেই। পিতা-পুত্রীদের সকলের পরনেই লাইফ জ্যাকেট থাকায় এবং সকলেই সুস্থ স্বাভাবিক আছে দেখে অনতিবিলম্বে এই উদ্ধার কার্যে ঝাঁপিয়ে পড়াটা তাদের কাছে খুব জরুরী মনে হলো না।

চলে যাবার আগে জনৈক তরুণ যুবককে নৌকা পানিতে নামানোর কাজ দিয়ে পেছনে রেখে গেলো পার্ক কর্মচারীরা। তারা ফিরে এলে নৌকায় মটর জুড়ে দিয়ে রওনা দেয়া হবে। জেরিন ভাবী তিক্ত কণ্ঠে বললেন, 'কেমন মানুষ ওরা? এই বিপদের মধ্যে দুইটা বাচ্চাকে ফেলে ওরা চলে গেলো? আপনে কিছু করেন না ভাই।'

আমি হাসি মুখে তাকে আশ্বস্ত করতে চাইলাম। 'বেশী চিন্তা করবেন না, কি আর হবে? বড় জোর ভাসতে ভাসতে অন্য কূলে গিয়ে ঠেকবে।'

'তারপর?

'আমাদের রেসকিউ বাহিনী তাদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবে। আপনি খামাখা ভয় পাচ্ছেন ভাবী। চিন্তার কিছু নাই'।

তিনি বিড়বিড়িয়ে বললেন, 'আপনার কোন কান্ডজ্ঞান নাই। এরা কেউ কি বোট চালাইতে পারে? আপনি কি করে ওদেরকে যেতে দিলেন? ছিঃ ছিঃ'!

শিলি উদার কণ্ঠে যোগ করলো, "এবার বুঝলেন তো ভাবী?"

আমি একটা বিরক্ত চাহনি দেই। সুযোগ পেলে কেউই ছেড়ে কথা বলে না। হাসান এবং তাপতি দাড় নিয়ে তাদের সংগ্রামে কিছুক্ষণের জন্য ক্ষান্ত দিয়েছিলো। কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর তারা আবার নতুন উদ্যমে 'ছলাৎ ছলাৎ' করে নৌকার চারদিকে ঝড় তুলে দিচ্ছে। লক্ষ্য করলাম দু'জনে দিক বিদিক হয়ে দাড় বাইছে বলেই নৌকা চক্রে পড়ে যাচ্ছে। চীৎকার করে যে কোন একজনকে ক্ষান্ত দিতে বললাম। তারা ভুল বুঝলো। দাড় ওঠা নামার গতি বেড়ে গেলো।

জেরিন ভাবী ক্ষুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, আপনে আর কিছু বইলেন না ভাই। আপনে কথা বললেই ওদের মাথা আরো খারাপ হইতেছে।

আমি চেপে গেলাম। লক্ষ্য করলাম হঠাৎ করেই বে-তে ধীর একটা স্রোত শুরু হয়েছে। হাসানদেরকে নিয়ে নৌকা ধীরে ধীরে বিপরীত পাশের তীর মুখী হয়ে এগিয়ে চলেছে। সেখানে পৌঁছেও অবশ্য লাভ বেশী নেই। নৌকা থেকে নামার মতো কোন যুতসই জায়গা নজর পড়লো না। ভালোর মধ্যে এই টুকুই যে পানির গভীরতা সেখানে যথেষ্ট কম হবে। বিপদের পরিমাণটা কমে যাবে। আমরা সবাই রেসকিউ টিমের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। শৌচাগারের সমস্যাটা হবার আর সময় পেলো না?

আমাদের সৌভাগ্যই বলতে হবে পার্কের কর্মীরা মিনিট দশেকের মধ্যেই ফিরে এলো। ওদিকের সমস্যা যত মারাত্মক মনে হয়েছিলো বাস্তবে তা না হওয়ায় একজনকে সেখানে রেখে দু'জন দ্রুত ফিরে এসেছে। খুব তোড় জোড় করে একটি ভারী স্পীড বোটের মটর নৌকায় তুললো তারা। ঠিকঠাক মত বসিয়ে স্টার্ট দিতে গিয়ে সবারই মুখ ব্যাজার। ইঞ্জিন স্টার্ট নিলো না। তাই নিয়ে আরেক হৈ-হল্লা শুরু হয়ে গেলো। উপস্থিত জনতার ভেতর থেকে দু'একটি তিক্ত মন্তব্য ভেসে এলো, 'কি রে আমার রেসকিউ টিম।'

সুউচ্চ হাসির রোল উঠলো। জনৈক টিপ্পনি কাটলো, 'রেসকিউ টিমকে রেসকিউ করার জন্য আরেকটা রেসকিউ টিম পাঠাতে হবে।'

খুব হাঃ হাঃ হোঃ হোঃ হলো।

দূরে তাকিয়ে দেখলাম তাপতি দাড় পানি থেকে তুলে ব্যাজার মুখে বসে আছে। হাসান একাই ডানে বায়ে করে কোন এক যাদুর বলে নৌকাটাকে বিপরীত তীরে নিয়ে যেতে পেরেছে। তার মুখে কৃতিত্বের হাসি দেখে মনে হয় জেরিন ভাবীর মস্তিষ্কে আগুন ধরে গিয়ে থাকবে। তিনি দাঁত কটমট করে বললেন, 'আবার হাসতাছে! লজ্জা শরম বইলা কি মানুষটার কিছু নাই। এক লক্ষ মানুষ জড় হইয়া গেছে এইখানে। মানুষ ভিডিও করতাছে। আমারে কেউ একটা দড়ি দিতে পারেন? কেমনে হাসতাছে দেখেন। ছিঃ ছিঃ!'

আমি অনেক কষ্টে হাসি দমন করি। বকুনি খাবার ভয় আমারও কম নয়। দেখা গেলো আমাদের রেসকিউ বাহিনী ঘর্মাক্ত কলেবরে ইঞ্জিনটাকে চালু করবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কোন মন্ত্রবলে কে জানে সকলের মুখের দিকে চেয়ে নিতান্ত অনীহা নিয়ে ইঞ্জিন শেষ পর্যন্ত ভট ভট করতে করতে স্টার্ট নিলো। তুমুল করতালিতে এলাকা মুখরিত হয়ে গেলো। তরুণ উদ্ধারকর্মীরা রক্তিম হয়ে উঠলো। ধারণা করতে কষ্ট হয় না এই জাতীয় উদ্ধার কার্য হয়তো তাদের তরুণ কর্ম জীবনে এটাই প্রথম। নৌকায় উঠে কিঞ্চিৎ সমস্যায় কেউ যে পড়ে না তা নয় কিন্তু সেই সমস্যা এমন দীর্ঘায়িত হতে পারে সেটা ধারণা করা কঠিন।

আরো পাঁচ মিনিট পরে প্রোটোকল অনুযায়ী যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে রেসকিউ টিমের যাত্রা শুরু হলো। আরেক দফা হাত তালি, হাসি, ব্যাঙ্গোক্তি। দেখা গেলো এই বিশেষ ক্ষেত্রে যারা অগ্রনী ভূমিকা পালন করেন তারা হচ্ছেন বর্ষীয়সী মহিলারা। একজন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'দেখো, মাঝ নদীতে গিয়ে এরাই উল্টে পাল্টে পড়বে। নৌকার যে ছিরি দেখছি।

হাসির রোল ওঠে। শেষ বিকেলের মোলায়েম হাওয়ায় এমন বিচিত্র এক দৃশ্য দেখতে দেখতে জনতার মনে নিশ্চয় বিশেষ আনন্দের অনুভূতি হয়ে থাকবে। জেরিন ভাবী তাদেরকে কঠিন একটি চাহনি দিলেন। 'খ্যাক খ্যাক করে হাসতাছে, দুইটা বাচ্চা ওখানে কোথায় ভেসে চলে যাচ্ছে আর এই উড়নচন্ডিগুলো নির্লজ্জের মতো হাসছে। ছিঃ ছিঃ!'

সব ভালো, যার শেষ ভালো। এখানেও তার ব্যতিক্রম হলো না। আমাদের তিন সদস্যের রেসকিউ টিম হাসানের সহায়তায় ভাসমান প্লাস্টিকের বোটের একটি আংটায় দড়ি বেঁধে তার তিন সওয়ারীসহ বোটটিকে টেনে এই তীরে এনে তুললো। তাদেরকে নিরাপদে ফিরতে দেখে জেরিনভাবীর মুখে হাসি ফুটলো। তিনি এবার ঝটপট ভিডিও ক্যামেরা বের করে ফেলে সম্পূর্ণ প্রত্যাবর্তনের চিত্রটুকু রেকর্ড করলেন। আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন ডিজিটাল ক্যামেরা, সব ছবি উঠে যাবে ভধপব নড়ড়শ-এ।

আমি এই সুযোগের সদব্যবহার করে বললাম 'আপনি খামাখা আমাকে ঝাড়ছিলেন। দেখেন, সবাই বহাল তবিয়তে ফিরে আসছে।'

তিনি হাসিমুখে বললেন, 'আমার বাচ্চা দুইটা ফিরা আসছে তাতেই আমি খুশী।'

আমি খোঁচা দিলাম, 'বাচ্চার বাবাকে দেখি স্মরণই করছেন না।'

তিনি ঠোঁট বাকিয়ে বললেন, 'ইস্ যে বেইজ্জতিটা করলো। আপনারা বন্ধুরা সব একই রকমই হইছেন।'

বুঝলাম এই লাইনে আলাপ বেশীদূর না যাওয়াই ভালো। তীরে পৌঁছে হাসান হাসিমুখে বললো, 'আমরাতো ঠিকই ছিলাম। রেসকিউ টিমের কোন দরকারই ছিলো না।'

ভেবেছিলাম তিক্ততা আসবে জেরিন ভাবীর কাছ থেকে। বাস্তবে ঝনঝনিয়ে উঠলো তাপতি। সে বাবার দিকে অগ্নি দৃষ্টি হেনে গর্জে উঠলো, 'এতো বয়স অইছে তোমার এখনো নৌকা চালাইতে পারো না। তোমার জীবনটা ষোল আনাই মিছা!'

উপন্যাসঃ

- শুভ্রবর্ষণ
- স্পর্শ
- এই যাত্রা
- ভুল করেছি ভালবেসে
- মোহনায় দাঁড়িয়ে
- লুকোচুরি
- নীলি

ইত্যাদি

বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী

- জুজুবা
- যাদুকরের তান্ডবলীলা

মুক্তিযুদ্ধকালীন স্মৃতিচারণ

- দামামা

ছোট গল্প

- নির্লজ ঘূর্ণন

রম্য রচনা

- সুখে দুঃখে কানাডা

আরোও অনেক লেখা

www.Shujarasheed.com